মধ্যভারত

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুই টাকা

শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ-কুমার উদয়চন্দ্ মহ্তাব্ বি-এ মহোদয়ের

করকমলে—

মধ্যভারত

যাত্রা আরম্ভ

বছর দুই আগে একদিন এক হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর শুভাগমন আমাদের বাড়ীতে হয়েছিল। আমার এক ছেলে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করেছিল "স্বামীজি, কোন্ কোন্ তীর্থ ভ্রমণ হয়েছে?" এই প্রশ্ন শুনে সন্ন্যাসী মহাশয় এক নিঃশ্বাসে ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে যত বড় তীর্থ আছে, তার সকলগুলির নাম করেছিল। তার এই উক্তি সত্য কি না, পরীক্ষা করবার জন্য আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম "সাধু, অমরনাথ যেতে হ'লে কোন্ পথে যেতে হয়?" সন্ন্যাসী নিঃসঙ্কোচে আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছিল—"অমরনাথ চন্দ্রনাথ তীরথকা এক শো মিল উত্তরমে—বড়া কঠিন তীরথ বাবা!" এর থেকেই সন্ন্যাসীজির ভ্রমণের দৌড় যে কতদূর, তা বুঝতে পেরেছিলাম! অনেক তীর্থ ভ্রমণ না করলে পাকা সাধু হওয়া যায় না,—সুতরাং 'সের-ভর আটা দেলায় দে রাম!'-ও হয় না।

এখন, আমি যদি বলি যে, এবারকার বড়দিনের সময়, পনর দিনের মধ্যে ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশের প্রায় সমস্ত 'তীরথ' দর্শন করে এসেছি—আর সেই পনর দিনের মধ্যে পাঁচদিনই কেটেছিল ইন্দোর রাজধানীতে—তা হলে, হয় ত অনেকেই ব'লে বস্‌বেন "এঁরাও দেখ্‌ছি, 'সের-ভর আটা

দেলায় দে রামে'র দলে। চন্দননগর বেড়িয়ে এসে ত ভ্রমণ-কাহিনী লেখা হয় না, তাই উজ্জয়িনী, অজন্তা, এলোরা ইত্যাদি ইত্যাদি তীর্থের নাম করা হচ্চে।"

এই সকল পাঠকের কাছে নিবেদন এই যে, বিগত বড়দিনের সময় আমরা পনর দিনের মধ্যে সত্যসত্যই অনেক স্থান বেড়িয়ে এসেছি এবং তার সাক্ষ্য-সাবুদের যদি দরকার হয়, তা'ও দিতে পারি।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই। বিগত বড়দিনের সময় মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর রাজধানীতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন হয়েছিল। এই অধিবেশনের চার পাঁচ মাস পূর্ব্বে অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে এক পত্র লিখে জানালেন যে, তাঁদের এই অধিবেশনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির পদ আমাকে গ্রহণ করতে হবে। তখন আমার শরীর বড়ই অসুস্থ ছিল। আমি সেই কথা নিবেদন ক'রে অব্যাহতি লাভের আরজী পেশ করেছিলাম। কিন্তু, আমার ইন্দোরের বন্ধুগণ সে আরজী নামঞ্জুর করলেন। তখন ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকারী শ্রীমান হরিদাস ও সুধাংশু-শেখর চট্টোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়ের পরামর্শ-অনুসারে ইন্দোরের সভাপতির পদ গ্রহণ করে সেখানে সম্মতিসূচক পত্র লিখলাম।

পদ ত গ্রহণ করলাম; যেন-তেন প্রকারে না হয় একটা অভিভাষণও লিখতে পারব; কিন্তু ইন্দোর ত বড় কম দূরের পথ নয়, আর পৌষ মাসের শীতও ভয়ঙ্কর। এ অবস্থায় একেলা এতটা পথ এই বৃদ্ধ বয়সে অতিক্রম করতে একটু দ্বিধা বোধ হোলো—শেষে কি নির্ব্বান্ধব পথে শীতেই জমাট হয়ে যাব। তখন এঁকে, ওঁকে, তাঁকে সঙ্গী হবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম। ইন্দোরের অভ্যর্থনা-সমিতিও বাঙ্গলা দেশের অনেক সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠালেন। প্রথম প্রথম দুই চার জন

।ামার সঙ্গী হ'বেন ব'লে আশ্বাস দিলেন ; কিন্তু সময় যত এগিয়ে ।াস্‌তে লাগল, ততই সঙ্গীরা অদৃশ্য হ'তে লাগলেন ; সুধু একজন টিঁকে গলেন ! তিনি আমার পরম স্নেহ-ভাজন, 'ওমার খৈয়ামে'র কবি শ্রীমান্ ।রেন্দ্র দেব। তাঁর মত কষ্ট-সহিষ্ণু, সেবাপরায়ণ, ভ্রাতৃবৎসল সঙ্গী পয়েছিলাম ব'লেই পনর দিনের মধ্যে এত বেড়িয়ে আস্‌তে পেরেছিলাম। ারা ঐ অঞ্চলে বেড়িয়ে এসেছেন, তাঁরা আমাদের ভ্রমণের কাহিনী শুনে সত্যসত্যই অবাক্ হয়ে গিয়েছেন, যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন সুদীর্ঘ পথ আমরা কেমন করে অতিবাহন করেছি—বিশেষতঃ আমার মত সত্তর বছর বয়সের রুগ্ন সঙ্গী নিয়ে !

গৌরচন্দ্রিকা এখানেই শেষ করা যাক্। ইন্দোর প্রবাসী-সাহিত্য-সম্মেলনের দিন স্থির হয়েছিল ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর ১৯২৮। সেখানকার বন্ধুগণ আমাকে লিখেছিলেন, আমি যেন ২২শে ডিসেম্বর বোম্বাই মেলে কলিকাতা থেকে যাত্রা করি ; তা হলে ২৪শে তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ দশটার সময় ইন্দোরে পৌঁছিতে পারব। ২৪শে, ২৫শে দুই দিন এই দীর্ঘ ভ্রমণের পর বিশ্রাম করে ২৬শে থেকে সম্মেলনে যোগ দেব। আমরাও সেই প্রস্তাবই অনুমোদন ক'রে স্থির করলাম, ২২শে ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যা সাতটা চৌত্রিশ মিনিটে হাবড়া থেকে যে বোম্বাই মেল ছাড়ে, তাতে উঠে সেই যে বিছানা পেতে শয়ন করব, আর পরের দিন রাত্রি দুইটার সময় খাণ্ডোয়া নেমে পাশের প্ল্যাটফরমেই ইন্দোর-গামী যে গাড়ী দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, তাতে উঠে আবার লেপ চাপা দিয়ে শয়ন করব। বড়দিনের সময় এক ভাড়ায় যাতায়াত করা যায় ; কিন্তু সকল রেলের কর্ত্তারাই এ অনুগ্রহ করেন না। জি-আই-পি রেলপথ এ অনুগ্রহ করেন নাই। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলপথের চেউকি ষ্টেসন থেকেই জি-আই-পি রেল আরম্ভ। পূর্ব্বে কিন্তু জব্বলপুর পর্য্যন্ত ই-আই-রেলের অধিকারভুক্ত ছিল ;

নলাম। 'কুপে' মাত্র দুইজনের স্থান থাকে, আমরাও দুইজন ; সুতরাং সে কামরাটী আমাদেরই সম্পূর্ণ দখলে হোলো। এ সুবিধার জন্য আমরা হরিদাস বাবুর কাছে ঋণী! আর, শ্রীমান্ সুধাংশু ভায়ার কাছে একটি উপদেশের জন্য এইখানেই ঋণ স্বীকার করে রাখি। আমরা স্থির করেছিলাম, একটানা একেবারে ইন্দোরে যাব ; ওদিকের সব দেখাশুনা শেষ করে ফিরবার সময় জব্বলপুরে নেমে মার্ব্বল পাহাড় ও নর্ম্মদা-প্রপাত দেখে আস্‌ব। শ্রীমান্ সুধাংশুশেখর বলেছিলেন "দাদা, সে কিছুতেই হয়ে উঠবে না। অত ঘুরে আস্‌তেই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন ; আর জব্বলপুরে নামা সম্ভবপর হবে না, মার্ব্বল-পাহাড়ও দেখা হবে না। তার চাইতে যাওয়ার সময়ই ওটা সেরে যান।" আমাদের হাতেও সময় ছিল ; ২৪শে ইন্দোরে পৌঁছিবার কথা ছিল ; ২৫শে পৌঁছিলেও কাজের কোন ক্ষতি হবে না। তাই, আমরা যাবার সময়ই জব্বলপুর নেমেছিলাম। শ্রীমান্ সুধাং উপদেশ গ্রহণ না করে যদি চলে যেতাম, তা হলে সত্যসত্যই ফেরবার সময় জব্বলপুর কেন স্বর্গপুরে যেতে বল্‌লেও আমরা সম্মত হতুম না— তখন ক্লান্ত দেহে, প্রায় শূন্য-পকেটে বাড়ীমুখো বাঙ্গালী!

বর্দ্ধমান ষ্টেসনে না পৌঁছান পর্য্যন্ত আমরা শয়ন করলাম না ; বর্দ্ধমান থেকে পরদিন প্রাতঃকালের চা-যোগের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন যোগ করবার জন্য বর্দ্ধমানে কিছু মিহিদানা সংগ্রহ করার অভিপ্রায় ছিল। বর্দ্ধমান থেকে গাড়ী ছাড়লেই শয়ন ও নিদ্রা। ভোর পাঁচটায় মোগল সরাইয়ে একবার একটু মাথা তুলেছিলাম মাত্র, তারপর পুনরায় নিদ্রা এ নিদ্রাভঙ্গ হোলো চেউকিতে গিয়ে। হাতমুখ ধুয়ে চা ও মিষ্টান্ন-যোগ করা গেল। নরেন্দ্র ভায়া পুনরায় শয়ন করলেন। এখান থেকেই জি-আই-পি রেলপথ আরম্ভ হোলো, শেষ হবে বোম্বাই গিয়ে। সাট্‌না ষ্টেসনেই আমরা জব্বলপুর নামবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

জব্বলপুর

আড়াইটার সময় জব্বলপুর ষ্টেসনে বোম্বাই মেল থেকে নেমে পড়লাম। শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু ব'লে দিয়েছিলেন, আমরা জব্বলপুর ষ্টেসন থেকেই যেন একখানি ট্যাক্‌সি নিয়ে তেরো মাইল দূরে ভেড়াঘাট ডাক-বাংলায় গিয়ে উঠি। সেই ডাকবাংলার নীচেই মার্ব্বল পাহাড়। আমরা কিন্তু সে উপদেশ প্রতিপালন করি নাই। আমরা মনে করলাম, বড়দিনের সময় আমাদেরই মত অনেক লোক, অনেক সাহেব বিবি মার্ব্বল-পাহাড় দেখ্‌তে এসে থাক্‌বেন। তাঁরা হয় ত ডাক-বাংলা দখল করে থাক্‌বেন। আমরা সেই তেরো মাইল গিয়ে যদি সেখানে স্থান না পাই, তা হ'লে ভারি বিপন্ন হয়ে পড়ব; সেই ভয়ানক শীতের রাত্রিতে কোথায় আশ্রয় পাব। এই সব মনে ক'রে আমরা স্থির করেছিলাম, ষ্টেসনের কাছেই জব্বলপুরের প্রধান ধনী গোকুলদাসের যে ধর্ম্মশালা আছে, সেখানেই আশ্রয় নেবো এবং পরদিন খুব ভোরে উঠে মার্ব্বল পাহাড় ও নর্ম্মদা-জলপ্রপাত দেখে ফিরে আড়াইটার সময় আবার বোম্বাই মেল ধ'রে ইন্দোর যাব। ষ্টেসনে নেমে কুলীদের জিজ্ঞাসা করে জান্‌তে পারলাম যে, ঐ ধর্ম্মশালা অতি নিকটে এবং সেখানে থাক্‌বার বেশ সুবিধা হবে। ধর্ম্মশালায় গিয়ে দেখ্‌লাম, সে একটা রাজপ্রাসাদের মত সুন্দর জায়গা। চারিদিকে পুষ্পোদ্যান, মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা। আমরা দ্বিতলের একটা কক্ষ অধিকার করলাম। শোনা গেল, ধর্ম্মশালা-সংলগ্ন যে ভোজনাগার ছিল, তা উঠে গেছে, কারণ এখানে যারা আসে তারা নিজেরাই রেঁধে-বেড়ে খায়। আমরা সে ব্যবস্থা করতে অসমর্থ।

শ্রীমান নরেন্দ্র তখন আমাকে ধর্ম্মশালায় রেখে রাত্রির আহারের ব্যবস্থা এবং পরদিন ভোরে মার্ব্বল-পাহাড় দেখতে যাওয়ার যান-বাহনের বন্দোবস্ত করতে চলে গেলেন।

আমি একেলা ধর্ম্মশালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি; এমন সময় সুমুখের পথ দিয়ে দুইটী বাঙ্গালী যুবক সাইকেলে চড়ে যাচ্ছিল। আমাকে ধর্ম্মশালার বারান্দায় দেখে তারা তাদের সাইকেলের গতিবেগ যে কম করল, তা বেশ বুঝতে পারলাম। দুইজনে যেন কি কথা হোলো। তার পরই তারা যে দিকে যাচ্ছিল, সে দিকে না গিয়ে, সাইকেল ফিরিয়ে ধর্ম্ম-শালার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল এবং সিঁড়ি দিয়ে উপরে এসে দুইজনেই আমাকে নমস্কার করল। যে যুবকটী বয়সে বড়, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল "আপনার নাম কি জলধর বাবু?" আমি বল্‌লাম "ঐ নামই আমার বটে।" তখন সে তার সঙ্গীর দিকে চেয়ে বল্‌ল "কেমন, আমি ঠিক ধরিনি।" আমি বল্‌লাম "আমি কিন্তু আপনাকে চিন্‌তে পারছি নে।" যুবক হেসে ব'ল্‌ল "আপনি আমাকে কি ক'রে চিন্‌বেন; আমি আপনাকে চিনি।" তার সঙ্গের যুবকটী তখন বল্‌ল "আপনি কবে এখানে এসেছেন?" আমি বল্‌লাম "এই আধ ঘণ্টা হোলো এসেছি। এখানে ত কাউকে চিনি না; আর থাকাও এই রাতটা; কা'ল সকালেই মার্ব্বল-পাহাড় দেখে বোম্বাই মেলে ইন্দোরে যাব। আমার সঙ্গে একটী বন্ধু আছেন। তাঁর নাম শ্রীনরেন্দ্র দেব। তিনি সব ব্যবস্থা করবার জন্য এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।" ছোট ছেলেটি বল্‌ল "তা এখানে থাক্‌বেন কেন? আমাদের বাড়ীতে চলুন।" আমি বল্‌লাম "সে আর হয় না, একটা রাত বৈ ত নয়,—এখানেই কাটিয়ে দেব।" বড় যুবকটী বল্‌ল "আমার নাম শ্রীললিতমোহন ঘোষ। আমি নাগপুরে একাউন্‌টেণ্ট-জেনারেল আফিসে চাকরী করি। আমিও মার্ব্বল-পাহাড় দেখবার জন্য

এখানে এসেছি। এঁদের বাড়ীতেই আজ সকালে এসে উঠেছি। কা'ল মার্ব্বল-পাহাড় দেখে, কা'লই কলিকাতায় যাব।" সঙ্গী ছেলেটীকে দেখিয়ে বল্‌ল "ইনি এখানকার স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত মণিমোহন চৌধুরীর ছেলে। এঁর নাম শ্রীঅবনীমোহন চৌধুরী।" অবনীমোহন বল্‌ল "আপনাদের কিছুতেই ছাড়ছিনে। বেশ, জিনিসপত্র এখানেই থাক; রাত্রিতে আমাদের বাসায় আহার করে এসে এখানে শুয়ে থাক্‌বেন।" আমি ভাবলাম, যে রকম গতিক দেখ্‌ছি, তাতে রাত্রিটা দোকানের পুরী খেয়েই কাটাতে হবে, নরেন্দ্র অন্য কোন উপায়ই করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে এমন নিমন্ত্রণ অস্বীকার করতে নেই। আমি বল্‌লাম "বেশ, তাই হবে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমার সঙ্গী এখনই আস্‌বেন। তিনি কি বলেন শোনা দরকার।" অবনী বল্‌ল "আর শোনামেলা নয়। আমি বাড়ী চল্‌লাম।" ললিতকে উদ্দেশ করে বল্‌ল "তুমি থাক, নরেন্দ্র-বাবু এলে এঁদের নিয়ে আমাদের বাসায় যাবে। আমি আগে গিয়ে বাবাকে খবর দিই।" এই ব'লে ছেলেটী যেই সিঁড়ির দিকে যাবে, সেই সময় নরেন্দ্র এসে উপস্থিত। এসেই তাড়াতাড়ি বল্‌লেন, "দাদা, কা'ল সকালে মার্ব্বল-পাহাড় আর নর্ম্মদা-প্রপাত দেখ্‌তে গেলে ফিরে এসে বোম্বাই-মেল ধরা যাবে না। তাই আমি টঙ্গা নিয়ে এসেছি। এখনই যেতে হবে। টঙ্গাওয়ালা বলেছে, সে দেড় ঘণ্টায় ভেড়াঘাটে পৌছে দেবে। এখন তিনটে বেজেছে। সারে চারটায় পৌছিলে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে খুব ভাল দেখা যাবে। আর বিলম্ব নয়, ঘরে চাবিবন্ধ করি।" আমি বল্‌লাম "তার পর রাত্রির আহার।" নরেন্দ্র বল্‌লেন "আজ বাজারের পুরী তরকারীই বিধাতা মাপিয়েছেন।" তার কথা শুনে ছেলে দুইটী হেসে উঠ্‌ল। আমি বল্‌লাম "আজ বিধাতা এখানকার মাষ্টার মশাই মণিমোহন চৌধুরীর বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন।" অবনীকে দেখিয়ে বললাম

"ইনিই মণিবাবুর ছেলে অবনীমোহন চৌধুরী।" নরেন্দ্র অবাক্। আমি তাঁকে সব কথা বল্লাম ; বিধাতা যে আমাদের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন এবং দুইটী জীবকে রাত্রির উপবাস থেকে রেহাই দিয়েছেন, সে কথাও বুঝিয়ে দিলাম। নরেন্দ্র বল্লেন "আমরা যে এখনই মার্ব্বল-পাহাড় দেখ্তে যাব।" অবনী বল্ল "সে পথও আমাদের বাড়ীর সুমুখ দিয়ে। চলুন, বাড়ীটা দেখিয়ে দেব ; তারপর ফিরবার সময় আমাদের বাড়ীতে আহার করে এখানে এসে বিশ্রাম করবেন। ললিতবাবুও পাহাড় দেখ্তে এসেছেন ; উনিও আপনাদের সঙ্গে গিয়ে আজই দেখে আসুন না।"

তাই ঠিক হোলো। আমি আর নরেন্দ্র টঙ্গায় উঠ্লাম। অবনী সাইকেল ছুটিয়ে আগে চ'লে গেল ; ললিত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল নিয়ে চল্ল।

মাইল খানেক গিয়েই মণিবাবুর বাসা। তিনি রাস্তায় এসে অভ্যর্থনা করলেন ; চা পান করে বেরুতে বল্লেন। তা হোলে বিলম্ব হয়ে যাবে ব'লে আমরা আর অপেক্ষা করলাম না। মণিবাবু আমাকে বল্লেন "আমার একটু পরিচয় দেবার আছে। আমি বন্দীপুর স্কুলে আপনার ছোট ভাই শশধরবাবুর কাছে পড়েছি। সুতরাং আজ আমার গুরুসেবার সৌভাগ্য হোলো।" ভাল কথা!

আর বিলম্ব না ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। টঙ্গাওয়ালা যা বলেছিল, তাই করল। ঠিক সাড়ে চারটায় আমাদের গাড়ী ভেড়াঘাটে পৌঁছিল। পথের মধ্যে দুইটী দ্রষ্টব্য স্থানের উল্লেখ টঙ্গাওয়ালা করেছিল— একটি চৌষট্টি যোগিনী, আর একটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধা রাণী দুর্গাবতীর মদন-মহল। কিন্তু, ঐ দুইটী তখন দেখ্তে গেলে আর মার্ব্বল-পাহাড় সে দিন দেখা হয় না। তাই দূর থেকেই অভিবাদন করে আমাদের দর্শন-বাসনা সংবরণ্ করতে হোলো।

মার্ব্বল-পাহাড় দেখ্‌তে গেলে নৌকা ভাড়া করে যেতে হয়। ওখানকার জেলা-বোর্ড দর্শকদের জন্য দুইখানি বোটের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। প্রত্যেক বোটের ভাড়া এক টাকা দশ আনা। এর জন্য একটা আফিস আছে। আমরা সেই আফিসে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ষাটটা সিঁড়ি নেমে জলের কিনারায় গেলাম। সেখান থেকে বোটে উঠে মার্ব্বল-পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করলাম। নর্ম্মদার একটী ক্ষুদ্র শাখার দুই পার্শ্বে মার্ব্বল-পাহাড়। জলও খুব গভীর। এই শাখা নদীটা একটা খালের মত। কোন স্থানে দশ হাত, কোন স্থানে পনর কুড়ি হাত প্রশস্ত। দুই দিকে নানা রংয়ের মার্ব্বল পাহাড় মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে চেয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে। সে যে কি দৃশ্য, তা আমি বর্ণনা করতে পারব না—শুধু বলতে পারি এ দৃশ্য পরম রমণীয়—এ দৃশ্য অপূর্ব্ব! এমন আর কখন দেখিনি। আমার সঙ্গী কবি নরেন্দ্র দেব এবং যুবক ললিত-মোহন একেবারে তন্ময় হয়ে গেলেন; তাঁরা সুধু বল্লেন—কি সুন্দর! আমি এইমাত্র বল্‌তে পারি, যাঁরা জব্বলপুরের এই মার্ব্বল-পাহাড় দেখেন নাই, তাঁদের একটা দেখবার মত জিনিস দেখা হয়নি। ভাষায় এ পাহাড়ের সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করা যায় না—কবির ভাষায় বল্‌তে হয়—

Gaze and wonder and adore.

যিনি এই অতুল সৌন্দর্য্যের আধার মার্ব্বল-পাহাড় দেখ্‌তে চান, আমি তাঁর সঙ্গী হয়ে দেখিয়ে আন্‌তে পারি, কিন্তু সে দৃশ্যের বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত।

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন নেমে আস্‌তে লাগল, তখন আমাদের তরী ঘাটে এল—তার আগে কেবলই কবির এই কয় লাইন মনে আস্‌ছিল—

"চৌদিকে রাঙ্গা মেঘ করে খেলা,
তরণী বেয়ে চল নাহি বেলা।"

সন্ধ্যার সময় ভেড়াঘাটে নেমে সিঁড়ি ভেঙ্গে আর উঠ্‌তে পারিনে সেই কোন্ ভোরে একটা ষ্টেসনে চা খাওয়া হয়েছিল; তার পর বেল দশটায় দুটো নামমাত্র আধপেট ভাত খেয়েছিলাম—আর এখন সন্ধ্যা ছয়টা; এর মধ্যে জলবিন্দুও পেটে পড়েনি—শরীরের অপরাধ কি? ধীরে ধীরে অতি কষ্টে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে ডাক-বাংলার দিকে গেলাম। রাস্তায় কিন্তু মনে হয়েছিল সেখানে এক পেয়ালা চা-ও মিল্‌বে না, এক-পাল শ্বেতাঙ্গ নরনারী হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু ডাক-বাংলায় গিয়ে দেখি জন-প্রাণীও নেই। অনেক ডাকাডাকির পর খানসামা এল। লোকটা বড় ভাল। আমরা ক্ষুধার্ত্ত শুনে বল্‌ল, সে তখনই চা, বিস্কুট আর ডিম-সিদ্ধ তৈরি করে দিতে পারে; তার ভাণ্ডারে আর কিছু নেই; সহর থেকে এই সন্ধ্যাবেলা আনিয়ে নেওয়াও অসম্ভব। যা আছে তারই অর্ডার দিয়ে আমরা ডাক-বাংলার বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শুয়ে পড়লাম। সেখান থেকে মার্ব্বল-পাহাড়ের দৃশ্য আরও সুন্দর। কিন্তু রাত্রি বেড়ে আস্‌তে লাগ্‌ল—দৃশ্যও অদৃশ্য হ'তে লাগ্‌ল। এ দিকে তখনও নর্ম্মদা জল-প্রপাত দেখা হয় নাই।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চা, বিস্কুট ও ডিম-সিদ্ধ এসে হাজির হোলো। আমি তিন পেয়ালা চা ও এক ডজন বিস্কুট খেয়ে ফেল্‌লাম। সঙ্গীদ্বয় চা ও বিস্কুটের সঙ্গে দশ বারোটা ডিম দেখতে দেখতে উদরস্থ করলেন; আমি ডিম খাই না—আমার ভাগটা এঁরা দুজনে বেঁটে নিলেন।

নর্ম্মদা জল-প্রপাত সেখান থেকে তিন মাইল দূরে। সেদিন কি তিথি বল্‌তে পারি না, তবে অন্ধকার তত গাঢ় ছিল না। একজন পথি-প্রদর্শক সঙ্গে নিয়ে সেই ধূলিময়, প্রস্তরখচিত পথে অতি সন্তর্পণে চল্‌তে লাগলাম। নর্ম্মদার তীরে গিয়েও প্রায় আধ মাইলের উপর পাথর ভেঙ্গে প্রপাতের কাছে গেলাম! তেমন শোভা কিছুই নেই। শীতকাল, জল বেশী নেই,

কাজেই প্রপাতেরও তেমন জোর নেই, সামান্য একটু উপর থেকে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। এই তিন মাইল হেঁটে আসার মজুরী পোষালো না।

সেখান থেকে ফিরে যখন টঙ্গার কাছে এলাম, তখন রাত্রি সাড়ে আটটা। মণিবাবু বারবার ক'রে ব'লে দিয়েছিলেন আটটার মধ্যে যেন ফিরি। বড়ই বিলম্ব হয়ে গেল, উপায় নেই। মণিবাবুর বাড়ী যখন পৌছিলাম, তখন রাত্রি দশটা বেজে গেছে। আহারাদি শেষ করে গৃহস্বামীকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রায় সাড়ে এগারটায় ধর্ম্মশালায় ফিরে এলাম। টঙ্গাওয়ালাকে বলে দেওয়া হোলো, সে যেন প্রাতঃকালে আটটার সময় আসে ; আমরা গোয়াড়ি-ঘাটে নর্ম্মদায় স্নান করতে যাব। গোয়াড়ি ঘাট সহর থেকে পাঁচ মাইল। এখানেই যাত্রীরা স্নান পূজা তর্পণাদি করে।

রাত্রিটা বেশ কাটল। সকালে উঠে সন্ধান নিয়ে জান্‌তে পারা গেল যে, এখানে বারণ-কোম্পানীর বাঙ্গালী-বাবুদের একটা হোটেল আছে ; সেখানে মধ্যাহ্ন-আহারের ব্যবস্থা হতে পারে। যথাসময়ে টঙ্গাওয়ালা হাজির। আমরা কাপড় গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। টঙ্গাওয়ালাকে ব'লে দেওয়া হোলো, আগে যেন বারণ-কোম্পানীর বাঙ্গালী-বাবুদের বাসায় যায়। সেখানে আহারের ব্যবস্থা ঠিক করে স্নানে যাওয়া যাবে। টঙ্গাওয়ালা বারণ কোম্পানী পর্য্যন্ত বুঝেছিল। সে প্রায় তিন মাইলের উপর টঙ্গা চালিয়ে বারণ কোম্পানীর কারখানায় গিয়ে হাজির। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, বাঙ্গালী বাবুরা সেখানে থাকেন না, সহরে ষ্টেসনের নিকট ধর্ম্মশালার কাছে তাঁদের বাসা, অর্থাৎ আমরা যে ধর্ম্মশালায় আছি, তারই নিকটে কোথাও তাঁরা থাকেন। বোঝা গেল, বিধাতা বিগত রাত্রের অপ্রত্যাশিত নিমন্ত্রণের শোধ এ বেলা নেবেন। যাক্, নর্ম্মদায় স্নান করে ত আগে পুণ্য সঞ্চয় করা যাক্, তার পর বিধাতার সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে।

নর্ম্মদার তীরে গিয়ে স্নানাদি শেষ করতে প্রায় এগারটা বেজে গেল। তার পর তাড়াতাড়ি টঙ্গা চালিয়ে সহরে এসে বারণ কোম্পানীর বাঙ্গালী বাবুদের আড্ডার খোঁজে যাওয়া গেল। আড্ডা পাওয়া গেল, কিন্তু শোনা গেল, তাঁরা হোটেল ভুলে দিয়েছেন। তখন ধর্ম্মশালার দুয়ারে আমাকে নামিয়ে দিয়ে নরেন্দ্র পুরী তরকারী কিন্‌তে গেলেন।

আমি ধর্ম্মশালার সিঁড়িতে উঠ্‌তেই দেখি অবনী ও আর একটী ছেলে সিঁড়িতে বসে আছে। কি ব্যাপার! অবনী বল্‌ল, তারা সেই বেলা সাড়ে আটটা থেকে আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। তার এই সঙ্গীটী এখানকার উকিল শ্রীযুক্ত বিবেকরঞ্জন সেন এম-এ, বি-এস্‌সি, এল-এল-ডি মহাশয়ের ভ্রাতা। আমাদের এ-বেলা তাঁর বাড়ীতে আহার করতে হবে। সেখানে সমস্ত প্রস্তুত। আমরা দুইটার মেলে যাব বলে তিনি এগারটার মধ্যেই সব ঠিক করে রেখেছেন। ক্রমাগত লোক পাঠাচ্ছেন। ভাল কথা—বিধাতা তা হ'লে আজও প্রচুর ব্যবস্থা করেছেন। নরেন্দ্র ষ্টেসনের কাছে খাবারের দোকানে পুরী কিন্‌তে গিয়েছে শুনে অবনী ষ্টেসনের দিকে দৌড়িল এবং অনতিবিলম্বে নরেন্দ্রকে পাকড়াও করে নিয়ে এল।

তখন বারটা বেজে গেছে। আমাদের সেই টঙ্গাওয়ালাকেই নিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত বিবেকরঞ্জন বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে গেলাম। বিবেক বাবুর বয়স এই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। জুনিয়ার উকিল হ'লেও পসার যে হয়েছে, তা তাঁর ঘর দ্বার, আসবাবপত্র ও আহারের প্রচুর অপেক্ষাও প্রচুর আয়োজন দেখেই বুঝতে পারা গেল। মোটামুটি ভদ্রতা-সঙ্গত কথাবার্ত্তা ব'লেই আমরা আহার করতে গেলাম, কারণ সময় অতি অল্প— আড়াইটায় ট্রেণ।

আহার করতে বসলাম। বিবেকবাবুর স্ত্রীই পরিবেশন করতে লাগলেন। নানা রকমের সুখাদ্য। আমি আহার করতে করতে বিবেক

াবুকে জিজ্ঞাসা করলাম "আচ্ছা বিবেক বাবু, আপনারা কি বৈদ্য ?"
তিনি বল্লেন "না, আমরা বৈদ্য নহি, আমরা কায়স্থ।" "কায়স্থ!
আপনাদের বাড়ী কোথায় ?" "হুগলী জেলায় কুমীরমোড়া।" আমি
একেবারে লাফিয়ে উঠলাম—"আরে, কুমীরমোড়ার সেনেরা যে আমার
জ্ঞাতি। আপনি রাজেন্দ্র বাবুকে চেনেন ? সত্যরঞ্জন বাবুকে চেনেন ?"
বিবেক বাবু বল্লেন "রাজেন্দ্রবাবু আমার কাকাবাবু, সত্যরঞ্জন আমার
জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে।" তখন আর কি—পরিচয় হয়ে গেল ; আমি
বিবেকরঞ্জনের জ্যেঠামশাই। বিবেকের স্ত্রী এসে বল্লেন "আমরা যে
সাহিত্যিক ভোজন করাতে বসেছিলাম, জ্যেঠামশাইকে ত নিমন্ত্রণ করি
নাই। পরিচয় যখন হোলো, তখন জ্যেঠামহাশয়কে না খাইয়ে ত ছাড়তে
পারিনে।" কি করি, ফিরবার সময় যদি পারি, তা হলে নামব, বল্লাম।
সাহিত্যিক হিসাবে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম এক সম্পূর্ণ অপরিচিত
বাঙ্গালী যুবকের বাড়ী ; শেষে কি না ফিরতে হোলো জ্যাঠামশাই হয়ে !
এরই নাম ভাগ্য !

প্রায় দেড়টার সময় এই নবপরিচিত অথচ নিকট জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র
ও বধূমাতাকে আশীর্ব্বাদ করে তাড়াতাড়ি ধর্ম্মশালায় ফিরে এলাম এবং
বিছানাপত্র বেঁধে নিয়ে ষ্টেসনে হাজির। ষ্টেসনে দেখা হোলো কাশী-হিন্দু-
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের
সঙ্গে। তিনিও ইন্দোর যাচ্ছেন ; প্রাতঃকালের গাড়ীতে এসে এখানে
এক বন্ধুর গৃহে উঠেছিলেন।

যথা-সময়ের আধঘণ্টা পরে মেল গাড়ী এলো। বিজ্ঞান বিভাগের
সভাপতি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা মহাশয় একটা দ্বিতীয়
শ্রেণীর কক্ষে ছিলেন। তাঁর আহ্বানে সেই কক্ষেই আমরা স্থান গ্রহণ
করলাম। সেইখানেই একজন ইন্দোরগামী সাহিত্যিকের কাছে শুনলাম,

আমাদের কেদারদাদা (স্বনামধন্য কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) অন্য
আছেন। তিনিও ইন্দোর যাচ্ছেন। তখন গাড়ী ছাড়বার বিলম্ব ছিল
তাই কেদারদাদার কাছে যেতে পারলাম না। পরের ষ্টেসনেই তাঁর
দেখা করলাম। রাত তিনটায় খাণ্ডোয়ায় অবতরণ; শীতে হি হি ক
করতে ইন্দোরগামী গাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ—২৫শে ডিসেম্বর
দশটায় ইন্দোর দাখিল।

ইন্দোর

ইন্দোরে গিয়েছিলাম প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে যোগ দিতে; সেই জন্য আগে সেই সাহিত্য-সম্মেলনের কথা বলাই কর্ত্তব্য; তারপর ইন্দোর রাজ্যের ইতিহাস। সে ইতিহাসও যেমন-তেমন নয়—ভারতবর্ষের একটী বরেণ্য রাজ্যের ইতিহাস,—যে রাজ্য প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী অহল্যা বাঈয়ের অতুলনীয় কীর্ত্তি-কাহিনীতে সমুজ্জল—যে রাজ্যের নরনারী এখনও পরম ভক্তিভরে মহারাণী অহল্যা বাঈয়ের নাম স্মরণ করে থাকে। সে কথা যথাস্থানে বল্‌তে চেষ্টা করব। এখন সম্মেলনের কথা বলি।

২৫শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার ইন্দোর ষ্টেশনে যখন গাড়ী পৌঁছিল, তখন বেলা দশটা। মাঝের একটা ষ্টেসনে আমরা চা-যোগ শেষ করে নিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গী কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে এ অঞ্চলে অনেকবার-এসেছিলেন। তিনি আমাদের ব'লে দিয়ে গেলেন যে, আমরা যেন গাড়ীর বাম দিকের দৃশ্যের দিকে দৃষ্টি রাখি, কারণ ইন্দোর রেলপথের এই দৃশ্য পরম রমণীয়। সত্যই তাই। রেলের রাস্তা সমতল ভূমি থেকে এত উচ্চ যে, নীচের দিকে চাইলে ভয় হয়—গাড়ী যদি একবার লাইন-চ্যুত হয়, তা হ'লে অনেক দূর নীচের খদে পড়ে আর খোঁজ-খবর মিলবে না, একেবারে সব শুদ্ধ বিসর্জ্জন হয়ে যাবে। এই ত সামান্য দূর পথ, ইহারই মধ্যে চারিটা টানেল;—পাহাড় কেটে পথ তৈরী করতে হয়েছে। এই আলোর বিকাশ, আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব অন্ধকার। সুড়ঙ্গগুলো খুব দীর্ঘ নয়।

যাঁরা বোম্বাই থেকে পুনায় গিয়েছেন, তাঁদের মুখে শুনেছি যে সে পথে চব্বিশ পঁচিশটা এই রকম সুড়ঙ্গ আছে। সুপ্রসিদ্ধ মাও সহর পার হয়ে একটা জল-প্রপাতও দেখ্‌তে পাওয়া গেল। মাও ষ্টেসনে পৌছিবার পূর্ব্বে দূর থেকে সহরটী দেখে আমার মনে হয়েছিল ঐ বুঝি ইন্দোর রাজধানী। সুরেন্দ্রবাবু সে ভ্রম সংশোধন করেছিলেন। তবে এ কথা বল্‌তে পারি, মাও সহরে এত কল-কারখানা, এত বড় বড় অট্টালিকা, এমন সুন্দর প্রশস্ত রাজপথ যে, নবাগতের পক্ষে এ সহরটীকে ইন্দোর ব'লে ভ্রম করা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

ইন্দোর ষ্টেসনে আমাদের জন্য একদল স্বেচ্ছাসেবক অপেক্ষা কর-ছিলেন। তাঁরা সংখ্যায় কুড়ি পঁচিশ জন হবেন; তাঁদের মধ্যে তিন চার জন মাত্র বাঙ্গালী যুবক,— ইন্দোরের মেডিকেল স্কুলের ছাত্র; আর সবাই মারাঠী। আর উপস্থিত ছিলেন আমারই স্বগ্রামবাসী, গ্রামসম্পর্কে দৌহিত্র ইন্দোর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ ধর এম-এ এবং এখানকার মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান রুদ্রেন্দ্র-কুমার পাল এম-এস্‌সি, এম-বি। তাঁরা আমাদের পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন; স্বেচ্ছাসেবকরা আমাদের বাক্স বিছানা নিয়ে উধাও হয়ে গেল। আমরা ষ্টেসনের বিশ্রামাগারে গেলাম। সেখান থেকে টঙ্গায় আরোহী হয়ে সহরে প্রবেশ করা গেল। তাঁদের কাছেই শুনলাম, আমাদের যেতে হবে মহারাজা শিবাজি রাও হাইস্কুলে। সেখানেই সকলের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে; আর সেই স্কুলের প্রকাণ্ড হলেই সম্মেলনের অধিবেশন হবে; আমাদের আর হাঁটাহাঁটি করতে হবে না। মহিলা-প্রতিনিধিরাও এই বিদ্যালয়ের এক অংশে থাক্‌বেন; শিল্প-প্রদর্শনীও এই বিদ্যালয়ের কক্ষান্তরে বস্‌বে। মূল সভাপতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইন্দোর রাজ্যের

প্রধান মন্ত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করবেন। আর খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা মহাশয় ইন্দোর কলেজের

মহারাজ শিবাজী রাও জি-সি-এস-আই

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্কন্ধে আরোহণ করবেন। তা ছাড়া সকলেই—স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে শিবাজী রাও স্কুলে অধিষ্ঠিত হবেন

স্থির হয়েছিলো। আমাদের টঙ্গা যখন স্কুলের গেটের ভিতরে গেল, তখন দেখলাম, গেট থেকে স্কুলের অট্টালিকা পর্য্যন্ত পত্র-পুষ্প-পতাকায় সুসজ্জিত হচ্ছে। আমরা মনে করেছিলাম, স্কুলের বাড়ী—সে আর এমন কি বড় একটা ইমারত; কিন্তু স্কুলের গাড়ী-বারাণ্ডায় যখন আমাদের টঙ্গা পৌঁছিল, তখন চেয়ে দেখি, এ ত স্কুল নয়, এ একটা প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ। আমাদের দেশের বড় বড় নামজাদা কলেজের বাড়ীও এর কাছে নগণ্য। এটাকে স্কুল না বলে, মহারাজ তুকাজী রাও হোলকারের বিশ্রামভবন বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা নানা কারুকার্য্য-ভূষিত; চারিদিকে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ; কক্ষগুলি সুবিস্তৃত। ইন্দোরের যে কয়জন প্রবাসী বাঙ্গালী আছেন, সকলেই সেখানে উপস্থিত; তাঁরা আমাদের সকলকেই পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। সে-দিনের গাড়ীতে আমরা প্রায় ত্রিশজন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলাম। কেদারদাদা প্রমুখ সকলেই দ্বিতলে বড় বড় কক্ষ অধিকার করে বস্‌লেন। অত সিঁড়ি ওঠা নামা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে বলে, সমিতির অধিবেশন হলের পার্শ্বেই একটী সুপ্রশস্ত কক্ষে নরেন্দ্রের ও আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হলো। অভ্যর্থনা সমিতি এই কক্ষে আটজন প্রতিনিধির অবস্থানের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। এ ব্যবস্থা উল্টে গেল; আমরা দুইজনেই সেই ঘর দখল করলাম। কয়েকখানা চারপাই, চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল প্রভৃতি দিয়ে ঘর সাজান হয়ে গেল; আমরা চারিদিনের জন্য সেই গৃহে গৃহস্থালী গুছিয়ে নিলাম। বলা বাহুল্য এ গোচগাছের মধ্যে আমি ছিলাম না। শ্রীমান্ নরেন্দ্র পাকা ওস্তাদের মত যেখানে যা করতে হয় করে ফেললেন; আর দণ্ডে দশবার আমার খবরদারী করতে লাগলেন—আমি একেবারে তাঁর নাবালক ছোট ভাই হয়ে গেলাম। তার পর চা ও মিষ্টান্ন-যোগ—তার আর দফাওয়ারী বিবরণ দিয়ে পাঠকদিগকে লুব্ধ করবো না।

স্নানাহার শেষ করতে বেলা একটা বেজে গেল। আহার কিন্তু নিরামিষ ; তা হলেও অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণের, বিশেষতঃ প্রতিনিধি-নিবাস বিভাগের সম্পাদক বৃদ্ধ দাদা নীলমাধব চট্টোপাধ্যায় ও পাকশালা বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুত মোহিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় যে প্রকার মিষ্ট বচন পরিবেশন করলেন, তাতেই আমাদের পেট ভরে গেল। আর স্বেচ্ছাসেবক বিভাগের সম্পাদক শ্রীমান রুদ্রেন্দ্রকুমার এবং সাধারণ বিভাগের সম্পাদক শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ সর্ব্বক্ষণ হাজির। কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় শুনলাম আজ কয়দিন থেকে বাড়ী ঘরদুয়োর ছেড়ে এই সম্মেলনের সাফল্যকল্পে আত্মনিয়োগ করে বসে আছেন। এতগুলি সহৃদয় সাহিত্যসেবক, প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রাণপণ চেষ্টায় এই সম্মেলন যে সর্ব্বপ্রকারে সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছিলো, সে কথা না বললেও চলে।

আমাদের আহারাদি শেষ হওয়ার পর, শ্রীমান্ শৈলেন্দ্র বল্লেন— "দাদাবাবু, যত কষ্টই হয়ে থাকুক পথে, এখন আর বিশ্রাম করতে পাচ্ছেন না। এখনই লালবাগে মহারাজের প্রাসাদ দেখতে যেতে হবে। বিনা পাশে কেহই সে প্রাসাদ দেখতে পান না। আমি পূর্ব্বাহ্নেই দশজনের পাশ নিয়ে রেখেছি। আজই দুটো থেকে চারটার মধ্যে প্রাসাদ দেখা শেষ করতে হবে।" তখন আর কি করা যায়! পথশ্রমের অবসাদ আর আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। আমি, নরেন আরও পাঁচ সাত জন লালবাগের রাজপ্রাসাদ দেখতে তখনই বের হয়ে পড়লাম।

এই লালবাগ প্রাসাদ সহর হতে তিন মাইল দূরে। যান সেই সনাতন। পশ্চিমের এক্কা আর দক্ষিণের টঙ্গা—এদের আর উন্নতি হোলো না ; সেই

চারখানি টঙ্গা নিয়ে ইন্দোরের সেই ধূলি-ধূসর পথ দিয়ে রাঙ্গা ধুলি উড়িয়ে চলতে লাগলাম। প্রাসাদের সম্মুখে গিয়ে সিংহদ্বার দেখে আমাদের কেমন যেন একটু অভক্তির উদয় হলো। ইন্দোর মহারাজের বাসভবনের সিংহদ্বার—আমরা মনে করেছিলাম কি যেন এক বৃহৎ ব্যাপার। ও হরি, এ একেবারে কলিকাতার বেলভেডিয়ারের লাটভবনের সিংহদ্বারের একটা নিকৃষ্ট অনুকরণ! মনটা সত্যসত্যই দমে গেল। বিশেষতঃ মহারাজ তুকাজী রাও হোলকার সম্বন্ধে এত অপ্রীতিকর ঘটনা এই কয় বছরের ভিতরে ঘটেছে যে, সেই মমতাজ বেগম, বাওলা-হত্যা, আমেরিক্যান রমণীকে জেতে তুলে দিশী নামকরণ করে বিবাহ, প্রভৃতি ব্যাপারে আমাদের মন পূর্ব্ব থেকেই একটা বিতৃষ্ণায় ভরে ছিলো। রাজবাড়ীর প্রবেশ-দ্বার দেখে সে বিতৃষ্ণা আরও বেড়ে গেল। তারপর রাজভবনে গিয়ে পাশ দেখাবামাত্র রক্ষিগণ দ্বার ছেড়ে দিল। তারা অনুরোধ করল, আমাদিগকে নগ্নপদে ও মস্তক আচ্ছাদন করে প্রাসাদে প্রবেশ করতে হবে। পদ নগ্ন করতে হবে, কিন্তু নগ্ন-শির চলবে না। শ্রীমান্ শৈলেন্দ্র এ কথা পূর্ব্বেই আমাদের জানিয়েছিলেন। আমি 'উত্তরা'র সহকারী সম্পাদক শ্রীমান্ সুরেশ চক্রবর্ত্তীর কাছ থেকে একটা গান্ধীটুপী চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেইটা মাথায় চড়িয়ে রাজ-ভবনের সম্মান রক্ষা করা গেল।

প্রাসাদে রাজ-পরিবারের কেহই নাই। মহারাজ তুকাজী রাও হোলকার রাজ্যত্যাগী—অথবা নির্ব্বাসিত বল্লেও হয়। তিনি তাঁর নব-পরিণীতা আমেরিক্যান সহ-ধর্ম্মিণীকে নিয়ে এখন না কি ফ্রান্সে বসবাস করছেন। এই সহ-ধর্ম্মিণীর সেখানে একটি কন্যাসন্তানও হয়েছে। সিংহাসনের অধিকারী মহারাজ তুকাজী রাওএর পত্র মহারাজকুমার

বছর পরেই দেশে ফিরে তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করবেন। মহারাণীরাও নানা স্থানে রয়েছেন; সুতরাং রাজপ্রাসাদ এখন কর্ম্ম-

মহারাজ তুকাজী রাও (তৃতীয়)

চারীদের দখলে আছে। রাজপ্রাসাদটী প্রকাণ্ড। প্রাসাদ-রক্ষকেরা আমাদের

সবগুলি ঘরই ইটালীয়ান মার্ব্বেল-মণ্ডিত, বহু কারুকার্য্যশোভিত। দেখলে চক্ষু জুড়িয়ে যায়। নাচঘর, দরবার-ঘর, বৈঠকখানা, শয়নঘর, স্নানের ঘর, ক্ষৌরকার্য্যের ঘর, এ যে কত, তার সংখ্যা করা যায় না। অনেকগুলি ঘরে বহুমূল্য গালিচা বিছানো; অনেক বহুমূল্য ভাল ভাল ছবি দেওয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে। সিংহদ্বার দেখে যে অভক্তি জন্মেছিলো, প্রাসাদের অভ্যন্তর-ভাগ দেখে মনে হলো রাজপ্রাসাদ বটে! বিলাতী ও দেশী আসবাবের সম্মেলনে প্রাসাদটী নয়ন-মনোহর হয়েছে। রাজা এখন পলিটিক্যাল এজেণ্টের শাসনাধীনে থাকলেও তিনি মন্ত্রিগণের সাহায্য নিয়ে রাজ্যশাসন করছেন; এবং রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য প্রাসাদাবলী যথারীতি সুসজ্জিত রেখেছেন।

এই প্রাসাদ থেকে যখন বেরুলাম, তখন চারটা বেজে গিয়েছে। এটি কিন্তু নূতন রাজ-প্রাসাদ; মহারাজ তুকাজী রাওএর আমলে নির্ম্মিত। এখান থেকে বেরিয়ে মহারাণী অহল্যাবাঈএর স্মৃতিমণ্ডিত পুরাতন রাজপ্রাসাদ দেখলাম। সে প্রাসাদের আর পূর্ব্বশ্রী নাই। ভেঙ্গে পড়ে নাই; কিন্তু সাজসজ্জা তেমন নাই। তবুও তা দেখবার মতন। কারণ এই প্রাসাদ থেকেই মহারাণী অহল্যাবাঈ রাজ্যশাসন করেছিলেন; এই প্রাসাদ হতেই তিনি যে অপূর্ব্ব শাসন-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, অনন্য-সাধারণ মহত্ত্বের আদর্শ দেখিয়েছিলেন, ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র-সমূহে যে অক্ষয়-কীর্ত্তি রেখে গিয়েছেন, কেদার বদরীনাথের যে রাজপথ নির্ম্মাণ করে দিয়ে, লক্ষ লক্ষ ধর্ম্ম-পিপাসু হিন্দু নরনারীর তীর্থ-দর্শনের সুবিধা করে দিয়ে আজও শত-কণ্ঠের আশীর্ব্বাদ লাভ করছেন, কাশীর অহল্যা ঘাট যাঁর দানের সাক্ষ্য এখনও দিচ্ছে, সেই পুরাতন রাজপ্রাসাদের সম্মুখে নতজানু হয়ে প্রণাম করতে কার না

এই প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে বড়বাজার, ছোট-বাজার প্রভৃতি দেখে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়া গেল। তাই পাঁচটা বাজতেই আমরা স্কুলে ফিরে এলুম। তারপর চা ও মিষ্টান্ন-যোগ করে, সমাগত সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও পুরাতন বন্ধুদের সংবর্দ্ধনা করতেই সন্ধ্যা হয়ে এলো। তখন ডাক্তার রুদ্রেন্দ্রকুমারকে সঙ্গে নিয়ে আমি ও নরেন্দ্র আবার পদব্রজে বেড়াতে বের হলুম; এবং সহরের বাইরে মহারাণী চন্দ্রাবতী মহিলা-বিদ্যালয় পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে এলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ায় বিদ্যালয়ের ভিতর যাওয়া হোলো না।

ফিরে যখন স্কুলের কাছে উপস্থিত হলাম, তখন দেখলাম, সমস্ত বিদ্যালয়টি ইলেক্‌ট্রিক আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়েছে। তখন আর তাকে স্কুল বলে মনে হোলো না; যেন একটি মায়াপুরী। তারপর আর কি—সে দিনের মত বিশ্রাম। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও দর্শনশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের কীর্ত্তন গান শুনে বড়ই আনন্দ অনুভব করা গেল।

২৬শে ডিসেম্বর বুধবার প্রাতঃকালে আর কোথাও যাওয়া হোলো না, কারণ এই দিনই সমিতির প্রথম অধিবেশন।

নানা স্থানের প্রতিনিধিগণের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কথাবার্ত্তায় সময় কেটে গেল। পুরুষ ও মহিলা নিয়ে প্রায় শতাবধি প্রতিনিধি তখন পর্য্যন্ত এসেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিগত বৎসরে মীরাটে যে অধিবেশন হয়েছিলো, সেখান থেকে একজন প্রতিনিধিও আসেননি; অন্ততঃ সেবারের কার্য্য বিবরণ পাঠ করবার জন্যও একজনের আসা উচিত

পুরাতন রাজপ্রাসাদ
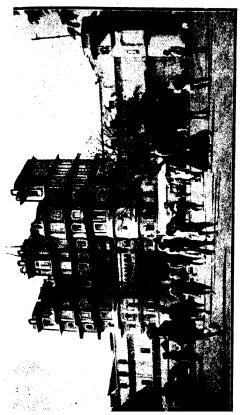
কেউ বাংলা দেশ থেকে আসেননি; অথচ সম্পাদক প্রমথ বাবুর নিক
শুনলাম, বাংলা দেশে প্রায় দুইশত সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠান
হয়েছিলো। শাখা-সভাপতিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় উপস্থি
হন নাই। মহিলা-সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ২৭শে
তারিখের প্রাতঃকালে আসবেন ব'লে তার করেছেন।

মধ্যাহ্ন বারোটার সময় অধিবেশনের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল, কি
সব গুছিয়ে নিতে দেরী হয়ে গেল। অধিবেশন আরম্ভ হোলো বেল
দেড়টায়। প্রথমে কয়েকটি বালক গান গাইল। তারপর অভ্যর্থনা
সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁর অভিভাষ
পাঠ করলেন। এই অভিভাষণটী অতি সুন্দর হয়েছিল। তারপর
স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীমান্
রুদ্রেন্দ্রকুমার পালের সমর্থনে সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করলেন।
মধ্যস্থলের মঞ্চের উপর সভাপতি ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি
আসন ছিল। দক্ষিণ পার্শ্বের মঞ্চের উপর শাখা-সভাপতিগণে
আসন ও বামদিকে, যে সমস্ত মহিলা পর্দ্দার বাহিরে আসেন, তাঁহাদে
আসন। মঞ্চের সম্মুখে এক দিকে প্রতিনিধিগণ ও অন্য দিকে স্থানীয়
দর্শকেরা আসন গ্রহণ করলেন। গ্যালারীতে পর্দ্দার আড়ালে পর্দ্দানসীন
মেয়েদের আসন নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। সভা পত্র-পুষ্প-পতাকায় সুন্দর
সজ্জিত করা হয়েছিলো। দেওয়ালে মহারাজা শিবাজী রাও হোলকার
ও নির্ব্বাসিত মহারাজা তুকাজী রাও হোলকারের তৈলচিত্র পুষ্পমাল্যে
ভূষিত করা হয়েছিলো। মহারাজ তুকাজী রাওই তাঁর পিতার নামে এই

নেক প্রতিষ্ঠান উনিই করে দিয়েছেন; অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানও রই দ্বারায় হয়েছে।

সভাপতি মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করলেন, তাতে সাহিত্যের থা মোটেই ছিল না। সে কথা তিনি তাঁর অভিভাষণেও স্পষ্টই লেছিলেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদের উন্নতি-কল্পে কি কি করা কর্ত্তব্য, ভাপতির অভিভাষণে এই কথারই আলোচনা ছিল। সম্মেলনের পত্র 'উত্তরা'কে নাগরী অক্ষরে ছাপাবার উপদেশও তিনি রেছিলেন। তার পর মামুলী ব্যাপার—যাঁরা না আসতে পেরে খ প্রকাশ করেছেন, তাঁদের পত্র পড়া হোলো, বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির দস্য নির্ব্বাচিত হোলো। তার পরই সেদিনের মত সভাভঙ্গ। সাড়ে রটায় আলোকচিত্র গৃহীত হোলো। তার পরই বিষয়-নির্ব্বাচন-মিতির কোলাহল। আমি বরাবরই এই কোলাহল থেকে দূরে কি; তাই তখন আমরা টঙ্গা নিয়ে সহরের অন্য অংশ দেখতে গেলাম। আমরা অর্থে—নরেন্দ্র, খুলনার অজিতানন্দবাবু, বুরহানপুর লের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আমি—এই চার জন।

ইন্দোরের প্রধান অংশ মহারাজা হোলকারের, অপর অংশ ইংরাজ বর্ণমেণ্টের। এই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এলাকার মধ্যে রেসিডেন্সি। আমরা প্রথমে রেসিডেন্সির দিকেই অগ্রসর হলাম। পথে পড়লো—ন্দোরের সর্ব্বপ্রধান ধনী স্বরূপদাসের প্রাসাদ। এ প্রাসাদ মহারাজের প্রাসাদ অপেক্ষা কোন অংশেই খাটো নয়; বরঞ্চ উদ্যান ও বৈঠকখানা হারাজের প্রাসাদ অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দর। তারপরেই রেসিডেন্সির মানায় গিয়ে সেনানিবাস, রেসিডেণ্টের বাড়ী, ড্যালি কলেজ, ও মেডিক্যাল স্কুল দেখলাম। এই মেডিক্যাল স্কুলে প্রায় তিনশত ছেলে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত। ছাত্রদের প্রথম দুই পরীক্ষা এখানেই হয়; কিন্তু শেষ পরীক্ষা উপরিউক্ত তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনওটিতে দিতে হয় এবং সেখান থেকেই উপাধি নিতে হয়। আমাদের শ্রীমান্ রুদ্রেন্দ্রকুমার এই বিদ্যালয়েরই অধ্যাপক।

সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরে দেখি, তখনও বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির কোলাহল শেষ হয় নাই। আমি আর বাসা থেকে বেরুবার সময় পেলাম না। পরদিন সাহিত্য-শাখার অধিবেশন। প্রায় চল্লিশটা প্রবন্ধ এসেছে। সেগুলি সব যদি সভায় পড়াতে হয় তা হলে চাই কি, ডিসেম্বর মাসের বাকি কটা দিন সেখানেই কাটাতে হয়। তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সাহিত্য-শাখার কাজ শেষ করতে হবে। আমি যা নিবেদন লিখে নিয়ে গেছলুম, তাই পড়তে একঘণ্টা সময় লাগবে, বাকি দু-ঘণ্টায় এই চল্লিশটি প্রবন্ধ পাঠ করতে হবে; অর্থাৎ কতকগুলিকে একেবারেই বাদ দিতে হবে, কতকগুলিকে পঠিত বলিয়া গৃহীত অর্থাৎ যে কথার কোনও অর্থই নাই, তাই করতে হবে; আর পাঁচ-সাতটিকে কবন্ধ করে কোন রকমে নিয়ম রক্ষা করতে হবে। আমার ত বলতে ইচ্ছা করে, কোনও সম্মেলনে প্রবন্ধ প্রেরণ—শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ! যাক্, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করা গেল। এদিকে শ্রীমান নরেন্দ্র দেব সাড়ে আটটার সময় এখানকার থিয়েটারে নাচ দেখতে গেলেন। রাত্রি এগারটার সময় ফিরে এসে বল্লেন—ছাই নাচ, মাঝে থেকে একটা টাকা দণ্ড দিতে হোলো।

২৭শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সারা দিনই সভা। প্রাতঃকালে বৃহত্তর বাংলা শাখার অধিবেশন। বারটা থেকে তিনটে পর্য্যন্ত সাহিত্য-শাখার অধিবেশন। তিনটে থেকে সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত সাধারণ সভা। সাড়ে চারটায় প্রদর্শনীর সভা ও দ্বারোদ্ঘাটন। সন্ধ্যার পরেই বিজ্ঞান-

তুকাজীরাও হাসপাতাল
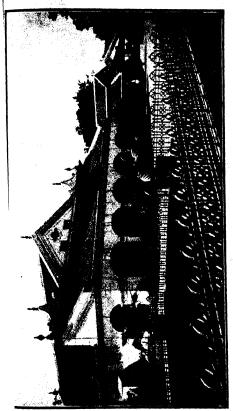
শাখার অধিবেশন। তারপর কীর্ত্তন। রাত বারটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনই চললো।

পরদিন ২৮শে ডিসেম্বর শুক্রবার প্রাতঃকালে ইতিহাস শাখার অধিবেশন। তারপর দর্শনশাখার অধিবেশন। এই দুইটি শেষ হতেই বারটা বেজে গেল। তাড়াতাড়ি স্নানাহার শেষ করে অর্থনীতি শাখার অধিবেশন। সাড়ে তিনটায় সে শাখার অধিবেশন শেষ। তখন আবার সাহিত্য শাখার অধিবেশন। যে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়া বাকি ছিলো, তা পড়া হয়ে গেলো। পাঁচটার সময়, বিদায় পালা আরম্ভ হলো। যথারীতি ধন্যবাদ আদান-প্রদানের পর—সপ্তম সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন শেষ।

এই সম্মেলন সম্বন্ধে আমার অতি সংক্ষিপ্ত কথায় যে দু'চারটা বাদ পড়ে গিয়েছে, আমার সৌভাগ্যক্রমে মহিলা-সভার সভানেত্রী, জয়পুর প্রবাসিনী পরম স্নেহময়ী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তা পূরণ করে দিয়েছেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইখানে উদ্ধৃত করে দিয়ে সপ্তম সাহিত্য-সম্মেলনের কথা আমি কোনও রকমে শেষ করলাম।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী লিখেছেন :—

"ইন্দোর পৌঁছতে সবচেয়ে দেরী বোধ হয় আমাদেরই হয়েছিল। কাজেই ২৬শের যা' কিছু সে আর আমরা দেখতে পাইনি। আমরা পৌঁছলাম ২৭শে। এদিন ছিল সাহিত্য-শাখার সভাপতি পূজনীয় শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের অভিভাষণ ; তার পর অন্য প্রবন্ধ, রচনাদি পাঠ। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটী ছোট গল্প পাঠ করলেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তারো চেয়ে ছোট একটী লেখা পড়লেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মেঘদূতের পূর্ব্ব মেঘের কথা পড়লেন এ সব তো সময়ে মাসিক পত্রের পাতায় ভাল করে পড়তে পাওয়া যাবে

আমাদের যা' ভাল লেগেছিল,—আর ওখানকার কর্ত্তৃপক্ষ নতুন যা' করেছিলেন,—তাই আমাদের সম্মিলনীর একটুখানি কথা।

বাঙালী ওখানে খুবই কম, সম্ভবতঃ সব শুদ্ধ ৪০ জনের বেশী নেই। কিন্তু ঐ ক'টী ঘর বাঙালীতে এমন সুন্দর আতিথেয়তার বন্দোবস্ত করেছিলেন যা' সত্যই আনন্দের। প্রতিনিধিদের থাকবার জায়গা হয়েছিল শিবাজী রাও বিদ্যালয়ে। তার উঠোন, বাইরের মস্ত খোলা জায়গা, প্রকাণ্ড বাড়ী নিয়ে প্রতিনিধিদের স্বচ্ছন্দে থাকবার কোনোই ব্যাঘাত ঘটেনি। আর ঐ-খানেই সম্মিলনীর অধিবেশনের স্থান হওয়াতে খাওয়া শোওয়ার সঙ্গে এমন সুবিধা হয়েছিল যে অনায়াসেই সব শাখায় সব সময়ে যোগ দেওয়া চলত। শিক্ষাবিভাগের অল্প কয়েকজন বাঙালী আর ঐ বিভাগেরই দুটী মাত্র বাঙালী মহিলা শ্রীমতী দাস ও শ্রীমতী হাজরা আর স্থানীয় জনকতক পরিবার মিলে যথেষ্ট আয়াস আর প্রীতির সঙ্গে সব ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে সম্মিলনীর আনন্দ উপভোগে কারুর অসুবিধা না হয়। অবশ্য সেই পরিমাণ কষ্ট তাঁরা নিজেরা পেয়েছিলেন, কেননা, তাঁদের বাড়ী যাওয়ার অবসর মিলত কি না সন্দেহ।

নতুন ছিল ওখানে শিল্প-শাখার প্রদর্শনী। এটী অন্যত্র কোথাও আগে হয়নি; শুধু তার জন্যও নয়,—সম্মিলনীতে প্রাদেশিক অধিবাসীর সঙ্গে প্রবাসী বাঙালীর যে এক ভাষাভাষী না হওয়ার জন্য একটী দূরত্ব থাকে, এই সূত্রে সেটী নষ্ট হয়ে যেন একটী সার্ব্বজনীন ভাব সৃষ্টি করেছিল। এইটীই ছিল ইন্দোর কর্ত্তৃপক্ষের বিশিষ্টতা। ওখানকার প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের এর পৃষ্ঠপোষকরূপে উদ্বোধন করবার কথা ছিল; তিনি অসুস্থ বলে আসতে না পারায় সম্মিলনীর সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তার উদ্বোধন করেন। আর তাঁর অভিভাষণটী পড়া হয়। এই শিল্প-চিত্র প্রদর্শনীতে ওখানকার গণ্যমান্য অনেকেই জড়

হয়েছিলেন। উদ্বোধনের আগে ‘বন্দেমাতরম্’ গানটী গাওয়া হয়েছিল। বাঙালীদের সঙ্গে ও-দেশবাসী আরও এদিক ওদিকের দু’চার জনও বোধ হয় ছিলেন ; তার মাঝখানে এই গানটী যেন একটী মনোরম গাম্ভীর্য্য এনে দিয়েছিল।

শিল্প-শালাতে অনেক রকম সংগ্রহ ছিল। ছবি, রেখাচিত্র, রেশম পশমে সেলাই করা ছবি, কাগজ কাপড় আঁশ ইত্যাদি নানা রকমের শিল্প কাজে তিনটী ঘর ভরা ছিল। অনেক খ্যাতনামা চিত্রকরের অপ্রকাশিত, প্রকাশিত ছবিও ছিল। বিদেশী চিত্রকরও ছিলেন, বাঙালীও ছিলেন তার মধ্যে। তার অনেকগুলি ছবিই অত ছবির মাঝ থেকেও বারে বারে চোখকে আকর্ষণ করেছে। ওখানকার বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েদের আঁকা ছবি আর রেশমে তোলা ক’টী কাজও খুব সুন্দর মনে হল। কুমারী ইন্দিরা রাও ব’লে একটী ও-দেশী মেয়ে আর শ্রীমতী ইন্দিরা রায় নামে একটী মেয়ে—তাদের আঁকা ছবিটিও প্রদর্শনীতে পুরস্কার পেয়েছে। শেষেরটী কাশীর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন রায়ের ভাইঝি। এদের শেখবার সুযোগ কতখানি আছে জানিনা—কিন্তু বয়সের তুলনায় মেয়েদের অনেক ছবিই ভাল লাগল। আশপাশের কাছাকাছি জায়গা থেকেও অনেক মেয়ে তাঁদের শিল্প-কাজ ওখানে দিয়াছিলেন ; আজমীরের মেয়েরও কাজ ছিল। দু’চার জন ওখানকার মেয়েও বোধ হয় প্রদর্শনী দেখতে এসেছিলেন,—ওঁদের ঘরের মেয়েদের শিল্প-কাজও ছিল। কলিকাতা থেকে প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-কুমার সেন মহাশয় পূজনীয় জলধর বাবুর একখানি ছবি, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দুইখানি ছবি, ও শ্রীযুক্ত শিবপদ ভৌমিক দুইখানি ছবি পাঠিয়েছিলেন।

এইদিন রাত্রেই বিজ্ঞানের সভাপতি শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা মহাশয়ের

ও সঙ্গীতের সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ ছিল। গান ইত্যাদিও ছিল। পরদিন সকালে বাকি শাখা ক'টীর অধিবেশন হয়।

লোক বেশী ইন্দোরে হয়নি। শুন্‌লাম তার প্রধান কারণ কংগ্রেস, আর দূর-পথের কষ্ট। মেয়ে ১০।১২ জন বিদেশ থেকে এসেছিলেন; বোধ হয় কাছাকাছি কর্ম্মস্থান থেকেও দু'চার ঘরের মেয়ে এসেছিলেন, যাদের মধ্যে অনেকগুলি চেনা মুখও দেখলাম, অনেকদিন পরে অতদূরে যাদের দেখতে পাব মনে করিনি। অনেক মেয়ে যেন ওর মাঝে বেশ আত্মীয়ার মতন হয়ে উঠেছিলেন। মনে হ'ল প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনী এই দূর প্রবাসে আমাদের প্রবাসী বাঙালী সম্মিলনও হয়ে উঠেছে। যে সব কর্ম্মচারীরা মফঃস্বলের, যাঁরা একধারে একপাশে থাকেন, কাজের গতিকে তাঁদের আর তাঁদের বাটীর মেয়েদেরও এই ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়, মেলামেশা হয়, অনেক সময় কুটুম্বিতা আত্মীয়তার সম্বন্ধ বেরিয়ে আসে। সবশুদ্ধ একটা মধুর বিষণ্ণতা মিশ্র আনন্দের মিলন হয়। ৺বিজয়ার প্রণাম আশীর্ব্বাদ অভিবাদনেও একটা মিশ্রভাবে সুখ দুঃখ থাকে, কিন্তু এতে দেখা হবে কিনা মনে হয়ে গভীরতর বিষাদে মনকে আচ্ছন্ন করে। তাই এ তিনদিনও যেন জাতীয় দুর্গোৎসবের মতনই মনে হতে লাগল।

মহিলা-সম্মিলনীতে এখানকার প্রায় সব বাঙালী মহিলাই জড় হয়েছিলেন; কিন্তু শীগ্‌গীর ফেরবার তাড়া ব'লে তাঁদের সঙ্গে আলাপের আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছি; কাজেই তাঁদের পরিচয় নেওয়াও হয়নি। মহিলা-সম্মিলনীতে একটী বেশ কথা উঠেছিল, তার সমর্থন প্রায় সব মেয়েই করলেন! তা' হচ্ছে মেয়েদের পিতৃ-সম্পত্তিতে আংশিক উত্তরাধিকার! আজমীরের একটী মহিলা এই বিষয়ে প্রস্তাব করেছিলেন। দেখলাম, অনেক মেয়েই শিক্ষা, উত্তরাধিকারের কথা, নিজেদের সুখ দুঃখের কথা, অন্তঃপুরের কোণে বসেও ভাবেন, আর আলোচনা করেন!

একটী মহিলা মুসলমান দায়ভাগের কথাও উত্থাপন করলেন! একজন মেয়ে বল্লেন,—'আমাদের তো হাত নয়, পুরুষরা যে ছেলেদেরই দিতে চা'ন, মেয়েদের জন্যে মাথা ঘামান না'!

ইন্দোর দেশটী যেন বেশ স্নিগ্ধ মনে হ'ল। সহরের মাঝখান দিয়ে একটী নদী গেছে। রাজপুতানার উষর রুক্ষতার পর ওখানকার শ্যামল স্নিগ্ধতা আমাদের চোখে বেশ লাগছিল। ওখানে ঠাকুর দেবতা সুগঠিত, সুন্দর জৈন মন্দিরও আছে। কিন্তু দেরীতে যাওয়া, আর শীগ্‌গীর ফেরাতে আমাদের ওখানকার কিছু দেখা হয় নি, প্রবাসীদের সঙ্গে জানা-শোনাও হয়নি। শুধু চোখের দেখার একটু তালিকা দিলাম। যাঁরা ভাল করে দেখেছেন তাঁদের কাছে সব পরিচয় আবার বোধ হয় পাওয়া যাবে।"

ইন্দোরের ইতিহাস

প্রথমে তিন দিন মাত্র ইন্দোরে ছিলাম, আর সে তিন দিনই সাহিত্য-সম্মেলন। তারই মধ্যে একটু-আধটুকু অবকাশ ক'রে নিয়ে সহরের চারিদিক যতটা পেরেছি দেখে নিয়েছি। সে বিবরণ দিয়েছি। এবারে আর তার জের মিটাতে হবে না—এবার ইন্দোরের ইতিহাস সম্বন্ধে অল্প দুই-চারিটি কথা বলব। ইন্দোরের কথা বলতে গিয়ে যদি প্রাতঃস্মরণীয়া, মহিমময়ী রাণী অহল্যা বাঈয়ের পবিত্র জীবন-কথা, তাঁর অতুলনীয় কীর্ত্তি-কাহিনী না বলি, তা হ'লে ইন্দোরের কথাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইন্দোর রাজ্য যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে, সে ত রাণী অহল্যা বাঈয়ের জন্যই এবং তাঁর শ্বশুর, ইন্দোর রাজ্যের স্থাপয়িতা স্বনামধন্য বীরবর মহারাজ মলহর রাও হোলকারের জন্যই। সুতরাং বীরকেশরী মলহর রাও হোলকার ও তাঁহার পুত্রবধূ রাণী অহল্যা বাঈয়ের জীবনের ইতিহাস অতি সংক্ষেপেও না ব'লে ইন্দোরের কথা শেষ করতে পারছিনে।

ইতিহাস কথাটা শুনে কেহ যদি এখানেই পড়া শেষ করতে চান, তা হ'লে তাঁদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, আমি যে ইতিহাস বল্‌ব, তা উপন্যাস অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়; বরঞ্চ উপন্যাসকারও যে কথা বল্‌তে গেলে বাস্তব হবে না ব'লে একটু সঙ্কোচ বোধ করেন, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ইন্দোর রাজ্যের স্থাপয়িতার জীবন-কাহিনী তার চাইতেও মনোরম এবং বাস্তব ঘটনা।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, সে ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দ। এই সময় হোল

নামে একটা গ্রামে খণ্ডুজী নামে একজন ক্ষত্রিয় বাস করতেন। জাতিতে ক্ষত্রিয় হলেও তাঁর অবস্থা এমন মলিন ছিল যে, তিনি পশুচারণ ও চাষবাস ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন এবং তাতেও তাঁর সংসারের অভাব মিট্‌ত না। এই দরিদ্র কৃষিজীবীর ঘরে ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে একটী শিশু জন্মগ্রহণ করে। শিশুর নাম মলহর রাও। মলহর রাওয়ের বয়স যখন চার-পাঁচ বৎসর, তখন তার বাপ খণ্ডুজী মারা যান। এ অবস্থায় যা হয়ে থাকে, তাই হোলো ; জ্ঞাতিরা নানা ছলে বিধবা ও নাবালকের যা সামান্য জমাজমি ছিল, তা আত্মসাৎ করতে লাগ্‌ল। বিধবা অন্য উপায় দেখ্‌তে না পেয়ে, স্বামীর ভিটার মায়া ত্যাগ করে পিতৃহীন বালকের হাত ধ'রে খান্দেশের অন্তর্গত তলোদেঁ নামক গ্রামে তাঁর ভ্রাতা নারায়ণজীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। নারায়ণজী একেবারে নিঃস্ব ছিলেন না। তাঁর কিছু জমিজমা ছিল ; তা ছাড়া তিনি একজন মারাঠী সামন্তের অধীনে কতকগুলি অশ্ব-সৈনিকের অধিনায়ক ছিলেন। নারায়ণজী ভগিনী ও পিতৃহীন ভাগিনেয়কে আশ্রয় দিতে বিমুখ হলেন না। তিনি মলহরের লেখাপড়া শিখাবার কোন ব্যবস্থা না করে তাকে পশুচারণে নিযুক্ত করলেন ; মলহরও রাখালী করতে আরম্ভ করল।

দুই তিন বছর এই রাখালীতেই কেটে গেল। একদিন দুপুর বেলায় পশুপাল মাঠে ছেড়ে দিয়ে মলহর একটা গাছের তলায় শুয়ে ছিল। সে যখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে, সেই সময় তার মুখের উপর রৌদ্র পড়েছিল। সেই রৌদ্রের তাপ থেকে বালককে রক্ষা করবার জন্য একটা সাপ ফণা ধরে তার মুখখানিকে আড়াল করেছিল। অন্যান্য রাখালেরা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল, সাপটাকে তাড়িয়ে দিতে তাদের সাহস হোলো না। রোদ যখন একটু সরে গেল, সাপও তখন জঙ্গলে চলে গেল। সাপের এমন দয়ার কথা নূতন নয়, আরও

দু-দশজন সম্বন্ধে এমন গল্প শুন্‌তে পাওয়া যায়; মলহরের মত তারাও রাখাল থেকে ভূপাল হয়েছিল।

অন্য রাখালদের মুখে এই আশ্চর্য্য ঘটনা শুনে নারায়ণজী এই ব্যাপারের কোন কারণ নির্দ্দেশ করতে না পেরে গ্রামের যিনি দৈবজ্ঞ, তাঁর কাছে গেলেন। দৈবজ্ঞ মহাশয় অনেক গণনা করে এবং বালক মলহরের করকোষ্ঠী দেখে ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন যে, এই ছেলে সামান্য নয়, এর ললাটে রাজযোগ লেখা আছে; মলহর দেশের রাজা হবে। নারায়ণজী কথাটা অবিশ্বাস করতে পারলেন না; শিবাজী মহারাজও ত সামান্য অবস্থা থেকেই এত বড় হয়েছিলেন! তিনি তখন মলহরকে রাখালী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু লেখাপড়া শিখ্‌তে লাগিয়ে দিলেন। এদিকে মলহরের মনেও বিশ্বাস জন্মিল যে, সে বড়মানুষ হবে, প্রতিষ্ঠাভাজন হবে। হোলোও তাই। আঠারো বৎসর বয়সে মলহর রাও মাতুলের অশ্বারোহী সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হলেন। তাঁর মনে তখন উচ্চ আশা বলবতী। তাঁর যোগ্যতা দেখাবার সুযোগও অবিলম্বে উপস্থিত হোলো। একটী যুদ্ধে তিনি নিজাম-উল্-মুল্‌কের একজন যুদ্ধবিশারদ সেনাপতিকে নিহত করায় তাঁর নাম চারিদিকে বেজে উঠল। তখন তাঁর মাতুল নারায়ণজী পরম সমাদরে তাঁকে নিজ কন্যাদান করলেন। মারাঠাদের মধ্যে মাতুল-কন্যাকে বিবাহ করা অশাস্ত্রীয় নয়।

মলহরের বীরত্বের কথা মারাঠা সমাজের নেতা ও অবিসম্বাদি অধিনায়ক পেশোয়া বাজীরাওয়ের কর্ণগোচর হোলো। তিনি মলহরকে নিজের সৈন্যদলে পাঁচশত সৈন্যের অধিনায়ক করে দিলেন। মাতুলের আশ্রয়ে প্রতিপালিত, মেষপালক, শৈশবে পিতৃহীন দরিদ্র বালক এখন মহাসম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। তখন তিনি আর মলহর রাও

রইলেন না। হোল গ্রামে যে তাঁর জন্ম হয়েছিল, সে কথা তিনি ভোলেন নাই। তাই তিনি নিজের নামের সঙ্গে 'হোলকার' কথাটা যোগ করে দিলেন। মারাঠা ভাষায় 'কার' শব্দের অর্থ অধিবাসী। মারাঠারা সকলেই নিজ নিজ নামের শেষে এমনই করে গ্রামের নামও যোগ করে থাকেন। এই মলহর রাও হোলকারই প্রসিদ্ধ হোলকার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

যখন মানুষের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, তখন যে কোন্ দিক দিয়ে ভাগ্যলক্ষ্মী ঘরে প্রবেশ করেন, স্বয়ং গৃহস্থও তা জান্‌তে পারেন না; মলহর রাওয়ের তাই হোলো। তাঁর বীরত্বে ও শাসনকার্য্যে সন্তুষ্ট হয়ে বাজীরাও পেশোয়া ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মদার উত্তর কূলের বারোটী প্রদেশ তাঁকে জাগীর দিলেন। তার পর মালব দেশ নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে মারাঠাদের যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছিল, সেই যুদ্ধে মলহর রাও এমন বীরত্ব দেখিয়েছিলেন যে, বাজীরাও তাঁকে মালব দেশের সর্ব্ববিষয়ের কর্ত্তাপদে নিযুক্ত করেন। শেষে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করায় মলহর রাওয়ের সৈন্যদিগের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বাজীরাও পেশোয়া তাঁকে ইন্দোর প্রদেশ জাগীর স্বরূপ প্রদান করেন। এই থেকেই ইন্দোর হোলকার রাজ্যের রাজধানী হয়, আর হোলগ্রামের দরিদ্র কৃষিজীবীর পুত্র সেই রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা হন। তার পর থেকে নানা বিবাদ-বিসংবাদের, নানা আত্মকলহের, নানা যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে সামান্য ইন্দোর সহর ধীরে ধীরে সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরীতে পরিণত হয়েছে। আর আমরা সেই ইন্দোরে প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্য সম্মেলন করতে গিয়েছিলাম।

মলহর রাও হোলকার বাহাদুরের অনন্যসাধারণ জীবন-কথা যদি আদ্যন্ত বল্‌তে হয়, তা হলে একটা প্রকাণ্ড পুস্তক হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করবার সুবিধা হবে না; যেটুকু বলা হয়েছে, তার থেকেই সকলে বুঝে নিতে পারবেন যে, মলহর রাও হোলকার

অহল্যাবাই ছত্রী
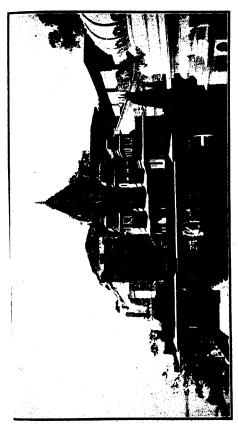
একটা মানুষের মত মানুষ ছিলেন। অতি সামান্য অবস্থা থেকে একটা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে হলে এবং তাকে মহারাষ্ট্র চক্রের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থানে উপনীত করতে হ'লে যা যা দরকার, মলহর রাও সে সবই করেছেন; যুদ্ধবিগ্রহ করেছেন, দরকার হ'লে কূট-নীতির আশ্রয়ও গ্রহণ করেছেন; অত্যাচারও যে করেন নাই, এ কথাও বলা যায় না। আবার এদিকে প্রজাপালন, শাসন ও সংরক্ষণে তাঁহার খ্যাতিও অসীম ছিল, দয়া দাক্ষিণ্যও তাঁহার অসীম ছিল। তাঁর সমগ্র জীবন-কাহিনী যাঁরা জানতে চান, তাঁদের কৌতূহল চরিতার্থের জন্য আমরা সার জন ম্যাল্‌কম লিখিত মধ্যভারতের ইতিহাসের উপর বরাত দিয়ে এ কাহিনী এখানেই শেষ করলাম।

মলহর রাওয়ের কথা বলা শেষ করলাম বলা ঠিক হোলো না; কারণ, যে মহীয়সী প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলার, রাজেন্দ্রাণীর পবিত্র জীবন-বৃত্তান্ত বল্‌তে হবে, তিনি মহারাজ মলহর রাও হোলকারেরই পুত্রবধূ। কেমন করে এক দরিদ্র পল্লী থেকে একটী দরিদ্র পিতার কন্যাকে কোলে করে এনে মলহর রাও তাঁর পুত্রবধূ পদে বরণ করে ইন্দোরের সিংহাসনে বসিয়ে গিয়েছিলেন, তা যে মলহর রাওয়ের রাজ্যলাভ অপেক্ষাও অধিকতর ঐশ্বর্য্য লাভ, সে কথা তিনিও অস্বীকার করেন নাই; যে কেহ সে অপূর্ব্ব কাহিনী পাঠ করবেন, তিনিও অস্বীকার করতে পারবেন না;—সকলকে একবাক্যে বল্‌তে হবে, মহারাজ মলহর রাও মানুষ চিন্‌তে অদ্বিতীয় ছিলেন।

এখন যাঁহার অসামান্য জীবন-কাহিনী লিখে লেখনী পবিত্র করব তিনি ইন্দোরের দেবী-স্বরূপিণী রাণী অহল্যাবাঈ—মহারাজ মলহর রাও হোলকারের-পথে-কুড়িয়ে পাওয়া অমূল্য রত্ন!

মলহর রাও কোন স্থানে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে

দরিয়া মহল
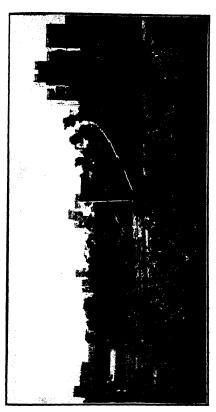
ফিরবার পথে পাথরডি নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হন। সেই গ্রাম-প্রান্তে একটী মন্দির ছিল ; মন্দিরের সুমুখে প্রকাণ্ড সরোবর, চারিদিকে উন্মুক্ত প্রান্তর। সময়ও অপরাহ্ণ। রাজা আদেশ প্রচার করলেন যে, এই সুন্দর স্থানেই তাঁরা সে দিনের মত বিশ্রাম করবেন। তাঁর সঙ্গের সৈন্যগণ সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ছাউনি করলেন। রাজা সরোবর-তীরস্থ মারুতী দেবীর মন্দিরের চত্বরে গিয়ে বসলেন।

গ্রামের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। সকলেই সৈন্য, গাড়ী ঘোড়া, লোক লস্কর দেখবার জন্য মারুতী দেবীর মন্দির-সম্মুখে উপস্থিত হোলো। গ্রামের যাঁরা প্রধান ব্যক্তি তাঁরা সকলেই সমাগত হয়ে রাজা মলহর রাওকে অভিবাদন করে তাঁর অনতিদূরে আসন গ্রহণ করলেন।

এই পাথরডি গ্রামে আনন্দ রাও সিন্দে নামে একজন দরিদ্র ক্ষত্রিয় বাস করতেন। তিনি দরিদ্র হলেও ধার্ম্মিক ও গ্রামের সকলের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। তাঁর একটি কন্যা ছিল। গ্রামের দৈবজ্ঞ ঠাকুর এই মেয়েটীর কোষ্ঠীবিচার ক'রে বলেছিলেন, অহল্যা রাজরাণী হবে। সকলেই এ কথায় উপহাস করেছিলেন ; কিন্তু ঠাকুর বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছিলেন, জ্যোতিষ গণনা যদি মিথ্যা না হয়, তা হলে এ মেয়েকে রাজরাণী হতেই হবে। গণৎকার ত ভবিষ্যদ্‌বাণী করেই খালাস, এদিকে অহল্যার দরিদ্র পিতা আনন্দরাও কন্যার বিবাহের জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। একমাত্র মেয়েকে তিনি তৎকালোচিত লেখাপড়া শিখিয়েছেন, গৃহকর্ম্মে নিপুণা করেছেন, অতিথি-অভ্যাগতের দেবতাজ্ঞানে সেবা করতে শিখিয়েছেন, দরিদ্র-কন্যাকে দরিদ্রের কষ্টে কাতর হতে শিখিয়েছেন। অহল্যা পরমাসুন্দরী না হ'লেও তার মুখে এমন একটা লাবণ্য ছিল যে, তাকে দেখ্‌লেই স্নেহ প্রকাশ করতে ইচ্ছা হোতো। গুণ ত মেয়ের সবই ছিল, কিন্তু আনন্দ রাওয়ের দারিদ্র্যই এত গুণের পথরোধ করে দাঁড়াল।

বিনা যৌতুকে মেয়ের বিয়ে এখনও হয় না, তখনও হোতো না। আনন্দ রাও কি ক'রবেন ?

এই সময় রাজা মলহর রাও পাথরডিতে এসে উপস্থিত হলেন। আর আর সকলের মত আনন্দ রাও-ও রাজ-সম্ভাষণে গেলেন এবং অদূরে যাহারা উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার কাছে গিয়ে বস্‌লেন। গাঁয়ে সৈন্য-সামন্ত এসেছে, রাজা এসেছেন শুনে অহল্যাও দেখতে গেল। গ্রামের বালক-বালিকারা দূর থেকে হাতী ঘোড়া দেখতে লাগল, মন্দিরের কাছে যেতে তাদের সাহস হোলো না। অহল্যা চেয়ে দেখ্‌লে যে, রাজার সুমুখে গ্রামের অনেক ভদ্রলোক ব'সে আছেন, তার পিতাও সেখানে আছেন। সে কিছুমাত্র ভয় না করে অগ্রসর হয়ে তার বাপের পাশে গিয়ে বস্‌ল।

রাজা মলহর রাও এই মেয়েটীকে নির্ভয়ে ধীরপদে আস্‌তে দেখে তার দিকে চেয়েছিলেন এবং তার লাবণ্যমাখা মুখ, অতি সহজ গতিভঙ্গী দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন, এ মেয়ে একটী রত্ন! তিনি মেয়েটীর নাম জিজ্ঞাসা করলে সে বিনীত ভাবে বলেছিল "আমার নাম অহল্যা বাঈ, আমি পূজনীয় শ্রীযুক্ত আনন্দ রাও সিন্দের কন্যা।"

মেয়েটীর কথা শুনে এবং তার মুখশ্রী দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তার পর গ্রামের আর দশজনের কাছে শুন্‌লেন, আনন্দ রাও তাঁরই স্বজাতি ; মেয়েটীও সুলক্ষণা ; গ্রামের সকলেই তাকে ভালবাসে। আনন্দ রাও দারিদ্র্যতা জন্য মেয়ের বিবাহের কিছুই করে উঠতে পারছেন না। রাজা সব কথা শুন্‌লেন ; কিন্তু নিজের মনোভাব প্রকাশ করলেন না। রাজধানী ইন্দোরে ফিরে গিয়ে শ্রীমতা অহল্যার সহিত তাঁহার একমাত্র পুত্র ও ইন্দোর রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী খাণ্ডে রাওয়ের বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করলেন। দরিদ্র আনন্দ রাও হাতে স্বর্গ পেলেন ; গণৎকারের ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হোলো ; ইন্দোরের রাজলক্ষ্মী দরিদ্রের পর্ণকুটীর থেকে

পরম সমাদরে, অতুল জয়োল্লাসের মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন; শুভদিনে শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

মাস কয়েক যেতে না যেতেই রাজা দেখ্‌তে পেলেন, তাঁর পুত্রবধূ অহল্যা অসামান্যা গুণবতী। কে বল্‌বে সে দরিদ্রের ঘরে জন্মেছিল? রাজ-অন্তঃপুরে এসে তার মনে কোন প্রকার গর্ব্বের উদয় হোলো না; এ সব ঐশ্বর্য্য তাকে একটুও প্রলুব্ধ করতে পারল না,—এ সব যেন তার জানা চেনা। তার ব্যবহার দেখে সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা, স্বামীর পরিচর্য্যা, পুরবাসীদিগের তত্ত্বাবধান—এ সব যেন তার পূর্ব্বেই শেখা হয়েছিল। তার পর দুই দশ দিন যেতে না যেতেই অহল্যা তার শ্বশুরের দক্ষিণ হস্ত হয়ে পড়ল;—কি রাজকার্য্য, কি যুদ্ধবিগ্রহ, কি সাংসারিক কার্য্য, সমস্ত বিষয়েই অমন অতুল প্রতিভাশালী, বীরত্বে মহনীয় রাজা মলহর রাও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, অহল্যার ন্যায় রমণী তিনি কখন দেখেন নাই। তাই তিনি সকল ব্যাপারে, সকল কার্য্যে অহল্যার পরামর্শপ্রার্থী হলেন; অহল্যাও শ্বশুরের সমস্ত ভার মাথায় তুলে নিলেন।

বিধাতার বিধান কে খণ্ডন করবে? অবিমিশ্র সুখ বুঝি কাহারও ভাগ্যে হয় না। কেন হয় না, তা জানিনে। কিন্তু যখন দেখি, যারা জীবনে কোন গর্হিত কাজ করে নাই; ধর্ম্মাচরণ, জনসেবা, দরিদ্রের দুঃখ মোচনই যাদের জীবনের কার্য্য; অকস্মাৎ তাদের মাথায় বজ্র পড়ে, তাদের আনন্দের হাট ভেঙ্গে যায়, তাদের সুখের উৎস শুকিয়ে যায়! বিশ্ববিধাতার এ কি বিধান, তিনিই জানেন। আমরা দেখে শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই, মোহবশে ব'লে বসি, এ বিশ্ব-বিধানে দয়া নেই—দয়া নেই। কিন্তু তখনই কে যেন অলক্ষ্যে থেকে ব'লে বসেন, ওরে মূঢ়, ভুলিস্‌নে তিনি দয়াময়—তিনি দয়াময়!

এডওয়ার্ড টাউনহল
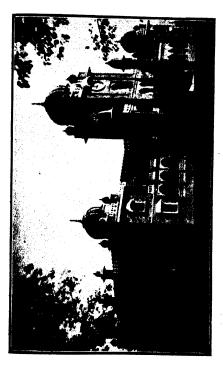
রাণী অহল্যা বাঈয়ের ভাগ্যাকাশে ঘন ঘটার সঞ্চার হোলো ;—প্র[illegible] বেগে অকস্মাৎ অশনি-পাত হয়ে তাঁর সকল সুখের আশা নির্ম্মূল হয়ে গেল ;—তাঁর প্রিয়তম স্বামী জাঠ নামক এক দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে দমন করতে গিয়ে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করলেন ;—অষ্টাদশ বৎসর মাত্র বয়সে রাজরাণী স্বামী-সুখে বঞ্চিতা হলেন—জীবনের আরম্ভ সময়েই তাঁর সুখের বাস ভেঙ্গে গেল। সম্বল মাত্র একটি পুত্র ও একটী কন্যা—আর রইলেন পুত্রশোক-কাতর রাজা মলহর রাও।

অহল্যা তখন স্বামীর চিতারোহণের সঙ্কল্প ক'রলেন। কি সুখে আর তিনি এ সংসারে বাস ক'রবেন ? তাঁহার এই সঙ্কল্পের কথা রাজা মলহর রাওয়ের কর্ণগোচর হ'বামাত্র তিনি পুত্রবধূর কাছে এলেন এবং চক্ষের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে বল্‌লেন, মা, এ তুমি কি করতে যাচ্ছ ? তুমিই যে আমার একমাত্র অবলম্বন। আমি মনে করছি, আমার অহল্যা মারা গিয়েছে, তোমাতে আমার একমাত্র পুত্র খণ্ডে রাও বেঁচে আছে। তুমিই আমার পুত্র-কন্যা সব। এ বৃদ্ধকে ফেলে তুমি কোথা যাবে মা ? আমার যে আর কেহ নাই। আমি অক্ষম হয়ে পড়েছি ; তুমি গেলে আমি একদিনও বাঁচব না। পিতৃহত্যা কোরো না অহল্যা !

রাজার এই কাতর বচন শুনে, অশ্রুসিক্ত নয়ন দেখে অহল্যা আর তাঁর সঙ্কল্প রক্ষা করতে পারলেন না ; শ্বশুরের চরণ-যুগল বক্ষে ধারণ করে তিনি চিতারোহণ-সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রলেন এবং সকল শোক-তাপ অন্তরের নিভৃত গুহায় স্বামীর চরণতলে সমর্পণ কোরে, ইন্দোরের রাজ্যভার গ্রহণ করলেন ;—রাজা মলহর রাও সর্ব্ব-কর্ম্ম ত্যাগ করে নির্জ্জনে ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন হলেন। অহল্যার শাসন এবং ক্ষমতা ও নিরপেক্ষ ব্যবহারে-দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিচয় পেয়ে প্রজাগণ তাঁহাকে দেবীরূপে পূজা করতে লাগল। অহল্যা সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করে রাজকার্য্য পরিচালন ও
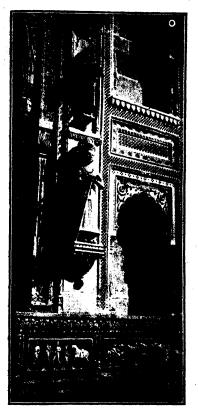
পুত্রকন্যাকে পালন করতে লাগ্‌লেন। কয়েক বৎসর এই ভাবে চালাবার পর রাজা মলহর রাও হোলকার পরলোকগত হলেন। যথাসময়ে পুত্র মালে রাও প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে রাণী অহল্যা বাঈ ধর্ম্ম-কর্ম্মে মনোনিবেশ করলেন।

কিন্তু এতেও মহা বিঘ্ন উপস্থিত হোলো; আর সে বিঘ্ন একেবারে অভাবনীয়। অহল্যার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা, সর্ব্বগুণশালিনী মায়ের গর্ভে ও খাণ্ডে রাওয়ের ন্যায় পিতার ঔরষে যে মালে রাওয়ের মত নৃশংস, অত্যাচারী, ব্যসনাসক্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে, এ কথা কেহ ভাবতেও পারে না। এ যে কেমন করে হয়, তাও কেউ নির্দ্দেশ করতে পারেন না। মালে রাও বল্‌তে গেলে শয়তানের একটা সংস্করণ,—যেমন নিষ্ঠুর, তেমনই উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র, তেমনই অব্যবস্থিত-চিত্ত। তাহার জ্বালায় অহল্যা বাঈ একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন; নানা অত্যাচার ও অবিচারের সংবাদ তাঁকে ব্যথিত করে তুলল। এমন কি, এই নরাধম পুত্র মায়ের ধর্ম্মাচরণেও বাধা দিতে আরম্ভ করল। মাতা ধর্ম্মাচরণের জন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে আহ্বান ক'রে আনেন, আর নরাধম পুত্র তাঁহাদিগকে অপমানিত ও বিড়ম্বিত করে বিদায় করেন। এই হতভাগ্য যুবকের নানা অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ আর দিতে ইচ্ছা করে না; এক কথায়, এমন নরপশু রাজসংসারে কেন, গৃহস্থের গৃহেও অতি কম দেখ্‌তে পাওয়া যায়। রাণী অহল্যা বাঈ কি করবেন? পুত্রকে নানা সদুপদেশ দেন, অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। কিছুতেই কিছু হয় না;—মালে রাওয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমেই বাড়তে লাগল।

সকলেরই একটা সীমা আছে—অত্যাচার অনাচারেরও আছে। মালে রাওয়ের অদৃষ্টে সেই সীমান্তকাল উপস্থিত হোলো। সে যে কি নিদারুণ ঘটনা, তা আর কি বল্‌ব।

মতি ভবন
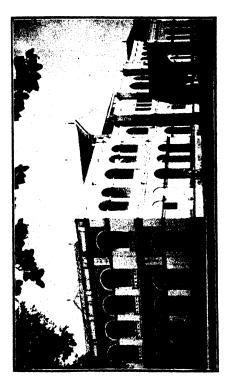
একজন শিল্পী মালে রাওয়ের বিরাগভাজন হয়। সে লোকটা কোন অন্যায় কাজই করে নাই; তবুও ক্রোধান্ধ হয়ে মালে রাও তার মাথা কেটে ফেলবার আদেশ দেন। সে মরবার সময় বলে যায় "আমাকে যেমন বিনা অপরাধে বধ করলে, এর শোধ আমি নেব, আমি মরেও তোমাকে ছাড়ব না।"

সেই লোকটার মৃত্যুর পরই মালে রাওয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেল। সে দিনরাত চীৎকার করত 'ঐ সে এলো আমাকে মারতে, রক্ষা কর, রক্ষা কর!' যখন তখনই এই বিভীষিকা তাকে উন্মাদ করে ফেলত; সে সেই শিল্পীর প্রেতাত্মা দেখে ভয়ে মৃতকল্প হোতো। পুত্রের এই কঠিন রোগের উপশমের জন্য অহল্যা নানা চিকিৎসার ক্রটী করলেন না; তা ছাড়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি কত করলেন; প্রেতাত্মার তুষ্টি সাধনের জন্য যে যা বলল, তাই করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না; মহাপাপের মহা-প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হোলো। দিন-রাত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে একদিন মালে রাওয়ের পাপ জীবনের লীলাখেলা শেষ হয়ে গেল। রাণী অহল্যা বাঈকে পুনরায় রাজ্যের ভার গ্রহণ করতে হোলো। তিনি আবার পূর্ব্বের অপেক্ষাও অধিকতর যোগ্যতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালন করতে লাগলেন। অনেকে তাঁকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করবার পরামর্শ দিয়েছিল; কিন্তু তিনি তখন সে পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। স্ত্রীলোক হোয়ে কাহারও পরামর্শ না নিয়ে এত বড় রাজ্য শাসন করছেন, শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধ উপেক্ষা করে দত্তকপুত্র গ্রহণে অসম্মত হলেন, কুলোকের কি ইহা প্রাণে সয়? এ কুলোকের মধ্যে দুইজন সর্দ্দার—একজন গুপ্ত শত্রু, সে প্রধান রাজকর্ম্মচারী গঙ্গাধর যশোবন্ত; আর একজন পুনার পেশোয়া মাধব রাওয়ের পিতৃব্য রাঘোবা দাদা। এই লোকটা যেমন লোভী, তেমনই ক্রূর। এই

যশোবন্তের সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করে রাণী অহল্যা বাঈকে পত্র লিখ্‌ল যে, তার কিছু টাকার দরকার; ইন্দোর রাজকোষ থেকে তাকে টাকা দেওয়া হোক্। অহল্যা এই ষড়যন্ত্রের কথা পূর্ব্বেই জানতে পেরেছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, ইন্দোরের রাজকোষের অর্থ তাঁহার নহে, ইহা ইন্দোরের প্রজাদের গচ্ছিত ধন। তিনি এই ধন দীন-দুঃখীদিগের মধ্যে বিতরণ করবার অধিকার পেয়েছেন। রাঘোবা দাদা যদি ইচ্ছা করেন, তা হলে যেদিন কাঙ্গালী-বিদায় হবে, সেদিন উপস্থিত হোলে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা পেতে পারেন।

এই কথা শুনে রাঘোবা দাদা একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌লেন। কি, এত বড় অপমান! তখন তিনি অহল্যার দর্পচূর্ণ করবার জন্য সৈন্য সজ্জা করলেন এবং অহল্যাকে লিখে পাঠালেন যে, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ নেবেন।

বেশ কথা! তপস্বিনী অহল্যা তখন রাজেন্দ্রাণী হলেন। চারিদিকে সংবাদ পাঠিয়ে যুদ্ধের আয়োজন করলেন; সকলকে সংবাদ দিলেন যে, এ যুদ্ধে তিনি সেনাপতির কাজ করবেন, নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন। তাঁর এই ঘোষণা শুনে দলে দলে লোক মহা উৎসাহে ইন্দোরের পতাকা-তলে সমবেত হ'তে লাগল; চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠ্‌তে লাগ্‌ল "রাণী অহল্যা মাঈকি জয়!"

যথাসময়ে রাজেন্দ্রাণী অহল্যা যুদ্ধ-সাজে সজ্জিতা হয়ে বাণ-ভরা তূণীর ও ধনু গ্রহণ করে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হলেন। সৈন্যগণ বিপুল জয়ধ্বনি করে এই মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির সম্মুখে আভূমি প্রণত হয়ে ইন্দোরের ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য অগ্রসর হোলো।

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে অহল্যা রাঘোবা দাদাকে ব'লে পাঠালেন যে, সৈন্যসামন্ত পিছনে থাকুক, তিনি সর্ব্বাগ্রে রাঘোবা দাদার সঙ্গে একাকিনী

যুদ্ধ করতে চান। রাঘোবা দাদা এতটা মনে করেন নাই। তাঁর সৈন্যেরাও অহল্যার এই রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। তখন যুদ্ধ আর হোলো না; রাঘোবা দাদার দল বিনাযুদ্ধেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন। রাণী অহল্যার জয়-নিনাদে সমস্ত ইন্দোর রাজ্য পূর্ণ হয়ে গেল। তার পর আরও ছোট ছোট অনেক আপদ উপস্থিত হয়েছিল; সে সকলই সহজে মিটে গিয়েছিল।

এখন রাণী দেখলেন যে, এত বড় বিস্তীর্ণ রাজ্যের সমস্ত কাজ তিনি একলা করে উঠতে পারছেন না, বিশেষ যুদ্ধ-বিগ্রহ ত লেগেই আছে। সেই জন্য তিনি মলহর রাওয়ের আত্মীয়, পরম বিশ্বাসভাজন তুকাজী রাও হোলকারকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে তাঁর উপর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যরক্ষার ভার দিলেন এবং নিজে অন্যান্য সমস্ত কাজের ভার গ্রহণ করলেন। এতে তাঁর ধর্ম্ম-কর্ম্মের কোনো ব্যাঘাত হোলো না। এই তুকাজি রাও হোলকারই অহল্যা বাঈয়ের মৃত্যুর পর ইন্দোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁহার বংশ এখনও ইন্দোরের রাজপদে অধিষ্ঠিত।

এইবার রাণী অহল্যা বাঈয়ের দানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে আমার কথা শেষ করব। রাজ্যের আবশ্যক ব্যয় বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকত, সে সমস্তই তিনি ধর্ম্মকার্য্যের জন্য উৎসর্গ করতেন। জলাশয় ও পান্থশালা নির্ম্মাণ, দেবমন্দির-প্রতিষ্ঠা, রাজপথ নির্ম্মাণ তাঁহার নিত্যকার্য্যের মধ্যে ছিল। ইন্দোর রাজ্যে যে তিনি কত জলাশয় খনন করিয়ে দিয়েছেন; কত রাজপথ, কত পান্থশালা, কত দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়েছেন, তার সংখ্যা করা যায় না। তাঁর এ দান সুধু ইন্দোরের সীমার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না; কাশীর ও গয়ার শ্রীমন্দির দুইটী তাঁরই অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হয়েছিল। জগন্নাথ-ক্ষেত্রে যাওয়ার যে পথ আছে, তা অহল্যার ব্যয়েই নির্ম্মিত। কাশীর অহল্যা বাঈয়ের ঘাট ও মথুরার বিশ্রাম-ঘাটের মত

সুন্দর ঘাট ভারতবর্ষে আর নাই বল্‌লেই হয়। দক্ষিণ অঞ্চলের অনেক দেবমূর্ত্তির স্নানের জন্য বহু বহু দূর থেকে প্রত্যহ গঙ্গাজল নিয়ে আসবার ব্যবস্থা তিনিই বহু অর্থব্যয়ে করেছিলেন। ভারতবর্ষের যে কোন তীর্থস্থানে তিনি গিয়েছেন, যে কোন সহরে তিনি গিয়েছেন, সেইখানেই জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে তিনি সকলের অভাব অসুবিধা দূর করবার জন্য অর্থ-সাহায্য করেছেন। তিনি দেশের অশেষবিধ কল্যাণের জন্য ইন্দোরের বিপুল রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

এই প্রাতঃস্মরণীয়া মহামহিমময়ী রাণী অহল্যা বাঈয়ের রাজধানীতে আমরা সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে গিয়েছিলাম। সেখানকার মুষ্টিমেয় প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের আদর আপ্যায়নের কথা আমি জীবনান্ত পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করব। ২৪শে ডিসেম্বর ইন্দোরে গিয়েছিলাম, তিনদিন সেখানে পরম সুখে বাস করেছিলাম; সাহিত্য চর্চ্চা, সঙ্গীতালাপ প্রভৃতিও হয়েছিল। ২৭শে ডিসেম্বর সম্মেলনের কার্য্য শেষ হ'লে রাত্রি দুইটার সময় আমরা মহাকবি কালিদাস ও রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী দেখ্‌তে গিয়েছিলাম।

উজ্জয়িনী

২৮শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর ইন্দোরের সম্মেলনের কাজ শেষ হবে; আমরা একটু তাড়াতাড়ি রাত্রির আহার শেষ করে, তিন চার ঘণ্টা বিশ্রামের পর রাত দুইটার গাড়ীতে উজ্জয়িনী যাত্রা করব, আগে থাকতে ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু ভগবান এ রাত্রিতে আমাদের অদৃষ্টে নিদ্রা লেখেন নাই, ব্যবস্থা ক'রে কি হবে? সম্মেলনের কাজ শেষ হ'তেই রাত্রি দশটা বেজে গেল। তার পর সংবাদ পাওয়া গেল, সে রাত্রির আহার্য্য প্রস্তুত হ'তে খানিকটা বিলম্ব হবে; কারণ, সেটী হচ্চে সম্মেলনের বিদায়ভোজ—তার জন্য একটু বিশেষ আয়োজন হচ্চে। বিরাট ভোজে অন্য দিন আপত্তির কোন কারণ ছিল না; কিন্তু এ দিনে এমন ভোজের সদ্ব্যবহার করা ঠিক হবে না। সারারাত্রি যে জাগতে হ'বে, তা জানাই গেল। তার পর ভোর পাঁচটায় উজ্জয়িনী নেমে বেলা বারটার মধ্যে যা কিছু দেখ্‌বার, সমস্ত শেষ করে স্নানাহার অন্তে দুটোর গাড়ী ধ'রে সন্ধ্যার সময় ইন্দোরে ফিরে আস্‌তেই হবে; তার পরদিন অতি প্রত্যূষে অর্থাৎ ভোর চারটার সময় আমাদের ধারনগর ও মাণ্ডু দেখ্‌তে যাওয়ার সমস্ত আয়োজন হয়ে আছে। এ অবস্থায় বিদায়-ভোজটা হৃষ্টান্তঃকরণে উপভোগ করা গেল না।

ভোজ শেষ হতে বারটা বেজে গেল। একটার সময় স্কুল থেকে বের হ'লে দেড়টায় ইন্দোর ষ্টেসনে পৌছা যাবে। সুতরাং, নিদ্রার নিকট বিদায় গ্রহণ করে ঘণ্টাখানেক গল্প করেই কাটিয়ে দেওয়া গেল। তার পর

ইন্দোরের সেই হিহি-কার শীতের মধ্যে, যার যা গরম কাপড় ছিল, সব গায়ে জড়িয়ে, কম্বল কাঁধে ফেলে উজ্জয়িনী যাত্রা করা গেল।

এবার আমাদের দলে অনেক লোক। নামগুলো এখানেই বলি। ছেলেমানুষ হোলেও প্রথমে নাম করতে হবে শ্রীমান্ আনন্দমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের; কারণ, উজ্জয়িনীতে গিয়ে যাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে এবং যিনি উজ্জয়িনী-প্রবাসী একমাত্র বাঙ্গালী, সেই পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র এই আনন্দমোহন। হরিদাস বাবু সম্মেলন উপলক্ষে একদিনের জন্য ইন্দোরে এসেছিলেন; ফিরে যাবার সময় তাঁর এই পুত্রটীকে রেখে গিয়েছেন আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য। ছেলেটীকে রেখে গিয়েও তাঁর কর্ত্তব্য শেষ হয়নি মনে করে তাঁর স্কুলের তিনটী বাঙ্গালী শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রভাতভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্তকে সম্মেলনের শেষ দিনে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই ত উজ্জয়িনীরই চারি মূর্ত্তি আমাদের সঙ্গী। তার পর সঙ্গী হলেন নাগপুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস, দেরাদুনের শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ রায়, হাজারীবাগ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গোরখপুরের শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত দিবাকর মুখোপাধ্যায়; এ ছাড়া শ্রীমান্ নরেন্দ্র ও আমি ত আছিই; সুতরাং বল্‌তে গেলে আমাদের একটা রেজিমেণ্ট।

রাত দুইটার সময় গাড়ীতে উঠা গেল;—যিনি যে গাড়ীতে স্থান পেলেন, তিনি সেখানেই উঠে পড়লেন। ঘণ্টা দেড়েক পরেই শীতে কাঁপতে কাঁপতে ফতেহাবাদ ষ্টেসনে গাড়ী বদল করে 'ফতেহাবাদ-চন্দ্রাবতীগঞ্জ' মিটার গেজ গাড়ীতে ওঠা গেল। ভোর পাঁচটা সাঁইত্রিশ মিনিটে উজ্জয়িনী,—তখনও আঁধার কাটে নাই।

এই সেই উজ্জয়িনী! ছেলেবেলায় পিসিমার কোলের কাছে শুয়ে যে

উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের কত কাহিনী শুনেছি—তাঁর সেই বত্রিশ সিংহাসনের গল্প, তাল-বেতালের কথা, বেতাল পঞ্চবিংশতির অপূর্ব্ব কাহিনী, তাঁর নবরত্নের সভা, আর সেই নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন কালিদাসের কত গল্প। এই সেই উজ্জয়িনী—যেখানকার মূর্খ কালিদাস না কি উষ্ট্র বানান করতে গিয়ে একবার 'র' বাদ দিয়েছিলেন. আবার সে ভ্রম সংশোধন করতে গিয়ে 'ষ' বাদ দিয়েছিলেন; আর তারই জন্য লাঞ্ছনা ভোগ করে যেদিকে দুই চোখ গিয়েছিল, সেই দিকে গিয়ে এক বনের মধ্যে জ্ঞান-বাপীর জল খেয়ে একদিনেই মহাকবি হয়ে গিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় সেই গল্প শুনতাম, আর মনে হোতো এক দৌড়ে উজ্জয়িনী গিয়ে সেই জ্ঞান-বাপীর জল যদি একটু খেতে পারতাম, তা হোলে আর স্কুলেও যেতে হোতো না, ভূগোলসূত্র, জ্যামিতি, ইতিহাস মুখস্থ করতে করতে হয়রাণ হবার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতাম, মাষ্টার মশাইদের বেতের ভয় আর থাকতো না—একদিনেই মহাকবি কালিদাস হ'য়ে পড়তাম। তার পর বয়স যখন বাড়লো, মহাকবির মেঘদূতে যখন পড়লাম, বিরহী যক্ষ আষাঢ়ের নবীন জলধরকে বল্‌ছেন—

> বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
> সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
> বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
> লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি।

আমার ভ্রমণসঙ্গী শ্রীমান্ নরেন্দ্র দেব তাঁর মেঘদূত কাব্যের অনুবাদ করতে গিয়ে উপরের শ্লোকটীর যে অনুবাদ দিয়েছেন, তাও এখানে তুলে দিচ্ছি—

তুমি যে উত্তরগামী
সে কথা জানিহে আমি,
উজ্জয়িনী কোন্ পথে
জানি তাও বিধিমতে ;
চলেছো আমার কাজে
এ কথাও বুকে বাজে,
তবু বলি—কিছু বেঁকে
উজ্জয়িনী যেও দেখে।
সেখানে প্রাসাদশিরে
ভুলোনা উঠিতে ধীরে,
পুর-নারী সেথা যারা,
চকিত-নয়না তারা,
বিজলি চমকে চোখে,
আঁখি ঠারে মরে লোকে!
সে লোচন ফুলবান
যদি নাহি বিঁধে প্রাণ,
জনম-জীবন তবে,
সবই সখা, বৃথা হবে!

সেখানকার পুর-ললনাদের বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত-চকিত লোচনের বিলোল
াপাঙ্গ দর্শনে যদি তুমি চিত্ত-প্রসাদ লাভ করতে না পার, তা হোলে
ামার জন্মই বৃথা। মহাকবির এই প্রলোভন-বাণী তখন, আমিও নবীন
াধর, আমার মনে যে ভাবের সঞ্চার করেছিল, এখন এই প্রবীণ বয়সে
র ক্ষীণ স্মৃতিটুকুও নেই বল্‌লে হয়—

সেই উজ্জয়িনীতে আজ উপস্থিত এই বৃদ্ধ বয়সে! বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিত চকিত লোচনের আকর্ষণ আর নেই; তবুও উজ্জয়িনী না দেখে ঘরে ফি যেতে মন চায়নি। আমাদেরও 'বক্রঃ পন্থা যদ্যপি', কারণ আমরা যা অজন্তা দেখতে; উজ্জয়িনী যেতে হ'লে পথটা একটু বেঁকে যায় বটে, তবু উজ্জয়িনী—মহাকবির পুণ্যস্মৃতি-পূত উজ্জয়িনী—তা না দেখ্‌লে 'লোচনৈব ঞ্চিতোঽসি',—যদিও সে উজ্জয়িনী আর নেই!

নবীন জলধরকে মহাকবি তাঁর বড় সাধের উজ্জয়িনী দেখাবার জ প্রলুব্ধ করতে গিয়ে বলেছেন—

প্রস্ফুটিত কমল কলির
গন্ধ মেখে অঙ্গময়
উষার মুখে শিপ্রা নদীর
স্নিগ্ধ বাতাস যখন বয়,
সারস কুলের সরস কূজন
দূর সুদূরে নে' যায় কত,
মুছিয়ে দে যায় সুন্দরীদের
নিশার গুরু ক্লান্তি যত!
প্রিয়াঙ্গনার তুষ্টি আশে
রাত্রি শেষে রসিক বঁধু
মিষ্ট কথার সঙ্গে যেমন
অঙ্গে বুলায় পরশ-মধু।

* * * * *

এগিয়ে যেও চণ্ডীনাথের,

পুণ্য-চরণ সেবার তরে,

বিশ্বজনের অর্ঘ্য যেথা

নিত্য জমে ভক্তিভরে।

তোমায় দেখে অবাক্ হয়ে

ভাববে যত শিবের চর,

কে এলো ঐ তাদের প্রভুর

কণ্ঠসম বর্ণধর ?

সুন্দরীদের স্নান-লীলাতে

কেশের সুবাস উথ্‌লে তোলা,

গন্ধাবতীর গন্ধবারি

পদ্মফুলের পরাগ-গোলা,

বইছে সেথায় মদির হাওয়া,

কইছে কানে মনের কথা,

কাঁপিয়ে তুলে ফুলের কলি

নাচিয়ে প্রতি কুঞ্জলতা।

* * * * *

নেহাৎ যদি গিয়েই পড়

সাঁঝের আগে ওদিক্ পানে

তিন ভুবনের তীর্থভূমি

চণ্ডীনাথে পীঠস্থানে,

থাক্‌বে সেথায় অপেক্ষাতে

ধৈর্য্য ধরে শান্ত মনে,

দিনান্তে ভাই চোখের আড়াল
না হয় ভানু যতক্ষণে।
মহাকালের মন্দিরেতে
সন্ধ্যারতি করলে সুরু
আকাশপথে আনন্দেতে
গর্জ্জে উঠো গভীর গুরু ;
সেই আরতির লগ্নে যদি
কণ্ঠে তোমার মৃদঙ্ বাজে,
ধন্য হবে তোমার ধ্বনি
শম্ভু সেবার পুণ্য কাজে।

* * * * *

সাঙ্গ হলে সায়ংকালে
শম্ভুনাথের সন্ধ্যারতি
নাচবে যখন তাণ্ডবনাচ
আত্মভোলা বিশ্বপতি,
তখন তুমি রক্তজবার
লাল্‌চে আভা অঙ্গে মেখে
নৃত্যমগন মহেশ্বরের
ঊর্দ্ধবাহুর গুচ্ছ ঢেকে
ছড়িয়ে দিও রুদ্র করে
মণ্ডলাকার তোমার কায়া,
সদ্য-হত হাতীর ছালের

ভক্তজনের ভক্তি দেখে
পার্ব্বতীও তৃপ্তপ্রাণে
দৃষ্টি মেলি চাইবে সখা
নির্নিমেষে তোমার পানে।

(শ্রীমান্ নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ)

সেকালের—সেই গৌরবোজ্জ্বল উজ্জয়িনীর শোভা-সৌন্দর্য্যের বিবরণ এই চাইতে ভাল করে কেউ কখন বলেন নি, বল্‌তে পারবেনও না ; সুতরাং আমিও ঐ কবিতা কয়টি উদ্ধৃত করে দিয়েই সে-কালের উজ্জয়িনী বর্ণনা শেষ করতে চেয়েছিলাম ; কিন্তু একটী নবীন ঐতিহাসিক বল্‌লেন, সে কি হয় ? উজ্জয়িনীর যে প্রকাণ্ড ইতিহাস আছে, মহাকবি কালিদাসের সময় যে এখনও নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয় নি ! এ সব কথা না থাক্‌লে যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নিতান্তই অসম্পূর্ণ হবে।

সুতরাং, আমার ভ্রমণের কথা আপাততঃ মুলতবী রেখে উজ্জয়িনীর বিবরণ বলাই ইতিহাস-সম্মত ব্যবস্থা।

প্রথমেই গোল লাগ্‌ল মহাকবি কালিদাসকে নিয়ে। তিনি কবে জন্মগ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষকে পবিত্র করেছিলেন, তা নিয়ে দিশী-বিদেশী পণ্ডিত-সমাজে মতভেদ আছে। তার পর তিনি বাঙ্গালী, না দক্ষিণী, না পাঞ্জাবী, তা নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে আলোচনা চল্‌ছে। কেহ বলেন, তিনি খাঁটি বাঙ্গালী,— এই আমাদের মুরশিদাবাদ জেলার কোন্ এক পল্লীতে না কি তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ; তাঁর লেখার মধ্য থেকে তার অনেক নজির পাওয়া যায়। যে সকল ফুল বাঙ্গালা দেশ ছাড়া আর কোথাও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, কালিদাস সেই সকল ফুলের কথা বলেছেন ; যে মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি বাঙ্গালী পুরনারীরা ব্যতীত আর কোন দেশের রমণীরা

করেন না, সেই হুলুধ্বনির কথা কালিদাস উল্লেখ করেছেন; ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব কালিদাস বাঙ্গালী। পল্লীকবি, উজানিনিবাসী পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ কুমুদরঞ্জন যে তাঁর জন্মভূমি উজানিকে উজ্জয়িনী ব'লে এখনও কেন উপস্থিত করেন নাই, তার কারণ নির্দ্দেশ করতে পারছিনে। আমার ত মনে হয়, কালিদাস ইংরাজ নহেন, ফরাসী নহেন, জার্ম্মাণ নহেন—আমাদেরই ভারতবাসী হিন্দু-সন্তান; ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়,—তা তিনি মুরশিদাবাদেরই অধিবাসী হন, আর আমেদাবাদেরই অধিবাসী হন। তবে ঐতিহাসিকেরা এই ব্যাপার নিয়ে অনুসন্ধান-কার্য্যে বিরত হবেন না, তা জানি; কিন্তু আমার এই অকিঞ্চিৎকর ভ্রমণ-কথার মধ্যে সে গভীর গবেষণা সম্ভবও হবে না, আমার শক্তি সামর্থ্যেও কুলাবে না! আমি এই ব'লেই সন্তুষ্ট যে, কালিদাস হিন্দু, তিনি আমাদেরই দেশে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন, এই আমাদের পরম গৌরবের কথা।

তার পর কালিদাস কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা নিয়েও মতভেদ আছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এ গোলেরও সুন্দর মীমাংসা আমাদের বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ ক'রে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল,
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল;
হারিয়ে গেছে সে সব অব্দ,
ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ,
গেছে যদি, আপদ গেছে, মিথ্যা কোলাহল।"

অর্থাৎ কবিবর বলছেন—মেঘদূত আছে, রঘুবংশ আছে, কুমারসম্ভব

জন্মের সন-তারিখ দিয়ে আমরা কি করব? কবিশ্রেষ্ঠের যখন এই রায়, তখন সন-তারিখ নির্ণয়ের ভার প্রত্নতাত্ত্বিকের উপর দিয়ে আমিও ও-কথাটা এখানেই শেষ করতে পারি।

এইবার উজ্জয়িনী রাজ্যের ইতিহাস! সেও বহুদিন পূর্ব্বের ব্যাপার হ'লেও ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তা মুছে যায়নি। সেই ইতিহাস অতি সংক্ষেপে এখানে নিবেদন করছি।

উজ্জয়িনী রাজ্যের গোড়ার কথা জানতে পারা যায় না, সেটা ইতি-হাসের আমলের বাইরে। তা হ'লেও হিন্দুরা ব'লে থাকেন যে, সৃষ্টির আদি থেকেই উজ্জয়িনী আছে। তন্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে যে, মহাদেব সতীদেহ বাহান্ন খণ্ডে বিভক্ত করলে, সেই দেহের এক অংশ বাহুমূল এই উজ্জয়িনীতে পড়েছিল; সুতরাং ইহা একটা পীঠস্থান। তা ছাড়া বিক্রমাদিত্যের বাসস্থান ব'লেও উজ্জয়িনী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

আর্য্যগণ যখন দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন, তখন তাঁরা এই উজ্জয়ি-নীতেই একটা বিশাল রাজ্য স্থাপন করেন। বৌদ্ধযুগেও উজ্জয়িনীর প্রাধান্য কম নাই; এখানে একটী বৃহৎ বৌদ্ধ বিহার ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

উজ্জয়িনী সম্বন্ধে প্রামাণ্য ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে। তখন উজ্জয়িনী মৌর্য্যরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। এই নগরই তখন বিশাল মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের পশ্চিমার্দ্ধের রাজধানী ছিল এবং রাজপ্রতিনিধি এখানেই বাস করতেন। মহারাজ অশোক এই উজ্জয়িনীরই রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাঁহার পিতার পরলোকগমনের সময় পর্য্যন্ত তিনি এই প্রদেশেরই শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

তার পরের প্রায় পাঁচশত বছরের কোন ইতিহাসই এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষ ভাগে উজ্জয়িনী ক্ষত্রপ রাজ্যের অন্তর্গত দেখতে পাওয়া যায়। তিন শত বৎসর এই প্রদেশ

ক্ষত্রপ রাজ্যের অধীন থাকে এবং সে সময় উজ্জয়িনী একটী প্রধান বাণিজ্য-স্থানে পরিণত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগে উজ্জয়িনী মগধের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনাধীন হয়।

তার পর খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে উজ্জয়িনী কনোজরাজ হর্ষবর্দ্ধনের অধিকার-ভুক্ত হয়। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হইলে বহুদিন পর্য্যন্ত এই প্রদেশ একেবারে অরাজক অবস্থায় থাকে। তখন চারিদিকে মারামারি কাটা-কাটি চল্‌তে থাকে। আজ একজন, আবার কয়েক বছর পরে আর একজন উজ্জয়িনী অধিকার করেন। অবশেষে এই রাজ্য প্রমারবংশীয় রাজপুত-গণের হস্তগত হয় এবং নবম হইতে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত প্রমারগণই এই রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন। এই সময় এই রাজ্যের সমৃদ্ধি এত বর্দ্ধিত হয় যে, অনেকে এই সময়েই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব হয়েছিল ব'লে মনে করেন। কিন্তু, ঐতিহাসিকেরা এ কথা মান্‌তে সম্মত নন, কারণ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, যে বিক্রমাদিত্যের সময় নবরত্নের সভা হয়েছিল এবং মহাকবি কালিদাস যে নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন, সে যে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকের কথা। এই সকল পণ্ডিতের কথা কতদূর প্রামাণ্য, তা ঐতিহাসিকেরা ঠিক করুন, আমি বিশ্ব-কবির ব্যবস্থা উল্লেখ ক'রে পূর্ব্বেই সে কথা সেরে দিয়েছি।

মুসলমান ইতিহাস-লেখকগণের মধ্যে আল্‌বেরুণির ইতিহাসেই উজ্জয়িনীর নাম প্রথম দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ১১৯৬—৯৭ অব্দে দিল্লীর বাদশা কুতবউদ্দীন এই দেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। দিল্লীর আর এক বাদশা আল্‌তামাস ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে উজ্জয়িনী পুনরায় আক্রমণ করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ মহাকালের মন্দির ও অন্যান্য বহু মন্দির ভেঙ্গে ফেলেন; এমন কি তিনি মন্দিরাদি ভেঙ্গে ও ধনরত্ন নিয়েই সন্তুষ্ট হন নি, মহাকালের শিবমূর্ত্তি না কি দিল্লীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। খৃষ্টীয়

অব্দ পর্য্যন্ত উজ্জয়িনী মালোয়ার সুলতানগণের অধিকারভুক্ত থাকে। তখন এখানে রাজধানী বা প্রতিনিধিগণের অবস্থান না থাকায় ইতিহাসে এ স্থানের নাম বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হয় নাই।

১৫৪২ অব্দে শেরশাহ মালোয়া জয় করেন এবং উজ্জয়িনীও সেই সঙ্গে তাঁহার দখলে আসে এবং সুরি সুলতান এই রাজ্য শাসন করেন। সুরি সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুবিখ্যাত বাজ বাহাদুর এই রাজ্য অধিকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; কিন্তু অল্প দিন পরেই বাজ বাহাদুর ১৫৬২ অব্দে সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক পরাজিত হন এবং এই রাজ্য উজ্জয়িনী সরকার নামে মোগল রাজ্যভুক্ত হয়। ১৭৩৩ অব্দে সম্রাট মহম্মদ শার সময়ে জয়পুরের মহারাজা সয়াজি রাও জয়সিং মালোয়ার শাসনকর্ত্তা হন। অবশেষে ১৭৪৫ অব্দে বাজীরাও পেশোয়া উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তা হন এবং তার পর ১৭৫০ অব্দের সমকালে এই রাজ্য সিন্ধিয়ার রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

উজ্জয়িনীর ইতিহাস অতি সংক্ষেপে বলা গেল। তা থেকে এখনকার উজ্জয়িনীর কোন ধারণাই হবার যো নেই। তবুও কালের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ ক'রে উজ্জয়িনী যা তার বুকে আঁকড়ে ধ'রে প'ড়ে আছে, তা দেখ্‌বার মত, তার পবিত্রতা উপভোগ করবার মত, তার ভগ্নস্তূপারণ্যের সম্মুখে নতজানু হয়ে সেই সুদূর অতীতের স্মৃতিকে পূজা করবার মত,—আর সেই প্রসন্নসলিলা শিপ্রার স্ফটিক শুভ্র জলে অবগাহন করে হৃদয় মন নির্ম্মল করবার মত। তাই আমরা উজ্জয়িনীতে ২৯শে ডিসেম্বর সারাদিন থেকে কি কি দেখে এসেছি, তারই একটা ছোটখাটো বিবরণ দিচ্ছি।

আমরা যে প্রকাণ্ড একটা দল বেঁধে উজ্জয়িনী দেখতে গিয়েছিলাম, এবং সেই উপলক্ষে উজ্জয়িনীর একমাত্র প্রবাসী বাঙ্গালী, ও-অঞ্চলের সর্ব্বজনমান্য 'মাষ্টারজি' শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর চড়াও ক'রে যে অত্যাচার ক'রে এসেছিলাম, তা ভুলবার নয়।

ভোর পাঁচটা সাঁইত্রিশ মিনিটের সময় যখন উজ্জয়িনী ষ্টেসনে নামলাম, তখনও রাত্রির অন্ধকার দূর হয় নাই ; কুয়াসায় চারিদিক আচ্ছন্ন ; রাস্তার আলোগুলি গায়ে-মুখে কালী মেখে ঝিমুচ্ছিল। সেই ভয়ঙ্কর শীতে পথে জনমানবের দেখা নেই। আমাদের সঙ্গে যে সব যাত্রী সেই গাড়ী থেকে নেমেছিল, তারা বোধ হয় শীতের ভয়েই পথে না নেমে মুসাফিরখানায় আশ্রয় নিয়েছিল। আমরা শীতে কম্পান্বিত-কলেবর হ'লেও ও-দেশের মুসাফিরখানায় ঢুকতে সাহসী হইনি ; বিশেষতঃ, আমাদের সঙ্গী, হরিদাস বাবুর মাষ্টার মশাইরা বল্লেন, বাসা বেশী দূর নয়, তিনচার মিনিটের পথ। তখন আর ষ্টেসনে অপেক্ষা করতে কেউই চাইলেন না। ষ্টেসনের বাইরে এসে দেখা গেল, সেই শীতের মধ্যে একখানি টঙ্গা যাত্রীর আশায় দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রতি কৃপা-পরবশ হয়েই হোক বা আমাকে শীতে একেবারে জড়সড় দেখেই হোক, সঙ্গীরা সেই টঙ্গাওয়ালাকে ধরলেন। বেশী দূর নয়, বেশ যেতে পারব, টঙ্গার কোন দরকার নেই—কেউ সে কথা কানে তুললেন না। আমাকে টঙ্গায় চাপিয়ে দিয়ে আমাদের পথের অন্যান্য সঙ্গী খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, হরিদাস বাবুর পুত্র শ্রীমান আনন্দমোহনের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। কেহ বল্লেন, গাড়ী থেকে নেমেই সে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য আগে বাড়ী গিয়েছে। সঙ্গী মাষ্টার বাবুরা বল্লেন, সে কোন কাজের কথাই নয়, আনন্দমোহন নিশ্চয়ই গাড়ীতে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিল, উজ্জয়িনী ষ্টেসনে নামতে পারে নাই, এগিয়ে চ'লে গিয়েছে ; যেখানে ঘুম ভাঙ্গবে সেখান থেকে ফেরত ট্রেণে আসবে। যে অন্ধকার, আর যে শীত, তাতে নিজেকেই টেনে নামানো যায় না, কোন্ গাড়ী থেকে কে নামল, কে প'ড়ে রইল, তা ঠিক করা একেবারেই অসম্ভব। তখন আর কি করা যায়, একজন মাষ্টার আমার সঙ্গী হ'লেন।

হ'লাম। আমরা গাড়ী থেকে নামতে-না-নামতেই আর সকলে এসে উপস্থিত হলেন। হরিদাস বাবু তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এসেই বল্লেন, সবাই ভিতরে আসুন, বাইরে বড় শীত।

তাঁর বৈঠকখানার ফরাসে গিয়ে সবাই শরীর ঢেলে দেবার উপক্রম করছেন দেখে তিনি বল্লেন, এখন আর শয়ন নয়; এক পেয়ালা চা খেয়ে শরীরটা তাজা করে, হাত মুখ ধুয়ে এসে সবাই বসুন, গরম জল তৈরী। তার পর বেশ করে চা যোগ করলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। কে যেন একজন দয়া-পরবশ হয়ে বল্লেন, দাদাকে একটু বিশ্রাম করতে দিন, সারারাত ঘুমুতে পারেন নি। হরিদাস বাবু হেসে বল্লেন, আমার এই ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে দাদার উপরই প্রয়োগ করতে হবে। গৃহস্থেরা বোধ হয় সেই শীতে ভোর পাঁচটায় উঠেই এই সব ব্যবস্থা করতে লেগে গিয়েছিলেন।

তখনই ভৃত্য চা নিয়ে এল। হরিদাস বাবু এক পেয়ালার বরাদ্দ করেছিলেন; কিন্তু, এক এক জন তিন চার পেয়ালা গলাধঃকরণ করে তবে হাই ছাড়লেন "আঃ, কি আরাম!" তার পর এতগুলো মানুষের হাতমুখ ধুয়ে আনতে-আসতেই সাতটা বেজে গেল। তখন আবার চা আর তার সঙ্গে গরম জিলিপী। নরেন্দ্র বল্লেন, এত সকালেই কি দোকান খুলেচে? হরিদাস বাবু সহাস্যে বল্লেন, গৃহিণী আজ একটু ভোরেই দোকান খুলেছেন। এর থেকেই হরিদাস বাবুর অতিথি-সৎকারের পরিচয় সবাই পাবেন। আমাদের কারও বাড়ীতে পৌষ মাসের সেই হাড় কন্‌কনে শীতের ভোরে নূতন জামাই বা কুটুম্বোত্তম গৃহিণীর ভ্রাতার আগমন হোলেও কোন সুগৃহিণী তাঁদের জন্যও অত ভোরে জিলিপী ভাজেন কি না জানি না।

ঠিক সাড়ে সাতটায় পাঁচখানি টঙ্গা হরিদাস বাবুর দ্বারে উপস্থিত

হোলো; তিনি পূর্ব্বদিনই এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন; এবং সাড়ে সাতটায় বেরুতে হবে ব'লেই ভোরে শয্যাগ্রহণ করতে দেন নাই।

আমরা তখনই বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের ব্যবস্থা পূর্ব্বে ঠিক হয়েছিল যে, আমরা বেলা সাড়ে বারোটার মধ্যে উজ্জয়িনীর যা কিছু দেখবার আছে সব দেখে শেষ করে, হরিদাসবাবুর বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-আহার করে দুইটার ট্রেণ ধরব এবং সন্ধ্যার সময় ইন্দোরে পৌঁছিব। তার পর রাত্রি চারটার সময় মাণ্ডু যাত্রা করব। মাণ্ডু যাবার ব্যবস্থা আর উন্টাবার যো ছিল না। কাজেই যে কোরেই হোক সন্ধ্যার মধ্যে ইন্দোরে যাওয়া চাই-ই; হরিদাস বাবুও এ ব্যবস্থার কথা জান্‌তেন। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কোরেও আমরা আমাদের পূর্ব্ব ব্যবস্থা ঠিক রাখতে পারিনি।

প্রথমে কোন্ দিকে যেতে হবে, তার জন্য আমাদের ভাবনা রইল না, কারণ স্বয়ং হরিদাস বাবুই আমাদের পথ-প্রদর্শনের ভার নিলেন, আর তাঁর মাষ্টারেরাও সঙ্গে রইলেন। টঙ্গা চল্‌তে লাগল, আর আমরা দেখতে লাগলাম, ভাঙ্গা বাড়ী, মাটী-ঢাকা বড় বড় স্তূপ, গরীব গৃহস্থদের যৎসামান্য কুটীর, আর মধ্যে মধ্যে দুই একটা সন্ন্যাসীদের আশ্রম! কোথায় মহাকবির বর্ণিত সেই উজ্জয়িনী, কোথায়—

বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং

বল্‌তে গেলে সে সব কিছুই নেই। সব কালের কুক্ষিগত হয়েছে। এক বিস্তৃত মহাশ্মশানে বাতাস হায় হায় করে ফিরছে; আর অতীতের সাক্ষ্য দেবার জন্য দুই একটা ক্ষুদ্র জীর্ণ মন্দির কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে; তাও হয় ত বেশী দিন থাক্‌বে না। আছেন সুধু কালের সংগ্রামে জয়ী হয়ে মহাকাল; তিনি এখনও অসংখ্য ভক্ত নরনারীর পূজা পেয়ে আসছেন। আর আছেন শিপ্রা নদী; এঁর তরঙ্গভঙ্গ কেউ প্রতিরোধ

সুন্দরীদের স্নানলীলাতে
কেশের সুবাস উথলে তোলা,
গন্ধাবতীর গন্ধবারি
পদ্মফুলের পরাগ গোলা—

সে সব কিছুই আর নেই। না থাক্, তবুও উজ্জয়িনী আছে—তার কালিদাস যে আছে! কালিদাসের অমৃতময় কাব্যাবলি, তাঁর নাটক যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন কালিদাস অমর—ততদিন তাঁর উজ্জয়িনী অমর।

আমাদের টঙ্গা প্রায় তিন মাইল এই সব দৃশ্য দেখাতে দেখাতে পৌঁছে দিলেন একটা মন্দিরের কাছে। মন্দিরটী মঙ্গলেশ্বরের। মন্দিরের পার্শ্বেই শিপ্রা নদী; বড় বড় সিঁড়ি-বাঁধানো ঘাট। আমরা প্রথমেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে জলের ধারে গেলাম। সুন্দর নদী, নির্ম্মল জল একেবারে টলটল করছে। আমরা সেই জলে হাতমুখ ধুয়ে বেশ তৃপ্তি অনুভব করলাম। তার পর উপরে উঠেই মঙ্গলেশ্বর দর্শন করতে গেলাম। উজ্জয়িনীর অন্যতম বিখ্যাত দেবতা এই মঙ্গলেশ্বর। প্রত্যেক মঙ্গলবারে এই মঙ্গলেশ্বরের নিকট মঙ্গলপ্রার্থী মাত্রেই এসে পূজা দিয়া থাকেন। ইনি চৌরাশী মহাদেবের অন্যতম। মঙ্গলেশ্বরের মন্দিরের চতুর্দ্দিক পাকা চত্বরে পরিবৃত। এই মন্দিরের ভিতরের প্রথম প্রবেশ-পথের সিঁড়িতে গেলেই দেখা যায় যে, তিন দিকে তিনটি ধর্ম্মশালা আছে। এই ধর্ম্মশালার মধ্যস্থলেই মঙ্গলেশ্বরের মন্দির। এই মন্দির খুব বড় না হলেও খুব প্রাচীন। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, এই সদানন্দ মহাদেবের দর্শনে লোকে মঙ্গল অবস্থায় সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করতে পারে। মঙ্গলেশ্বরের দক্ষিণে উত্তরেশ্বর নামে আর এক মহাদেব আছেন। এঁর মন্দিরের নীচে একটি বড় ও সুন্দর ঘাট আছে; সেখানে নদীতে খুব বেশী জল। প্রতি বছর পঞ্চকোশীর দিন ও অষ্টতীর্থের দিবসে মেলা বসে। এখানে গঙ্গা ঘাট

ও গঙ্গামন্দির আছে। একটি ধর্ম্মশালা আছে, তাতেই এখানকার যাত্রীদের আশ্রয় মিলে। এই ধর্ম্মশালা সরদার কিবেন প্রস্তুত করান। গঙ্গা-দশমীতে এখানে একটী উৎসব হয়। মন্দির দেখা হলে পুরোহিতকে কিছু দেওয়া গেল। পুরোহিত তখন চন্দন ঘট্‌ছিলেন। আমি বল্‌লাম "ঠাকুর, ঐ চন্দনকাঠটুকু আমায় দেবেন, আমি বাড়ী নিয়ে যাব।" পুরোহিত তখনই সেই কাঠখানি আমাকে দিলেন। হরিদাসবাবু বল্‌লেন এবং আমরাও মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে দেখ্‌লাম, চারিদিকে অসংখ্য চন্দন গাছ রয়েছে।

এই মন্দিরের কাছেই আর একটা পুরাতন মন্দির দেখ্‌লাম। মন্দিরের পাণ্ডারা বল্‌লেন, এটা সান্দীপনি মুনির আশ্রম। এইখানে কৃষ্ণ বলরাম মুনির পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। মুনিবরের মূর্ত্তিরও পূজা হয়, কৃষ্ণ বলরামও পূজা পেয়ে থাকেন। আমার কিন্তু এ কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হোলো না।

এই মন্দিরে যাবার সময় একটি সুন্দর দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে নি। বেরিয়ে যখন টঙ্গায় উঠতে যাবো, তখন, ডান-দিকে একেবারে শিপ্রার উপরে একটী অতি পুরাতন বটের গাছ দেখ্‌লাম; তার চারি দিক পাথর দিয়ে বাঁধান। আর পাশেই শিপ্রা নদী পর্য্যন্ত সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। আমি বল্‌লাম, কালিদাসের আবাস-স্থান কোথায় ছিল, তা যখন কেহই এই স্তূপারণ্যের ভিতর থেকে বার করতে পারেন নি, আমি কিন্তু তাঁর মেঘদূত লেখার ঠিক জায়গা আবিষ্কার করেছি। আমি বলছি, এই সুন্দর বটবৃক্ষের ছায়ায় বসে মহাকবি কালিদাস তাঁর মেঘদূত লিখে-ছিলেন। শ্রীমান্ নরেন্দ্র মেঘদূত নিয়ে বড়ই নাড়াচাড়া করছেন; তিনি বল্‌লেন, দাদা ভুলে যাচ্ছেন কালিদাস সৌখীন পুরুষ ছিলেন, এ জায়গায়

মেনে নিতে রাজি নই। চারিদিকে সুবৃহৎ অসংখ্য চন্দন বৃক্ষ; তারই পাশে এই প্রস্তর-মণ্ডিত ছায়াশীতল বটবৃক্ষ, আর সম্মুখেই স্বচ্ছসলিলা শিপ্রা প্রবাহিতা; এ স্থানে কালিদাস দূরে থাকুন আমাদের মত খালিদাসও ছোটখাটো একটা 'কশ্চিৎকান্তা' মক্স করতে পারে—এমনই সৌন্দর্য্য এই স্থানের। প্রমাণ প্রয়োগ যখন করতে পারিনি, তখন উচ্ছ্বাসের মুখে যা হয় একটু বলে ফেলা গেলো; যদিও দিব্য করে বলতে পারি, এই সুদীর্ঘ জীবনে কোনও দিন কবিতা লেখারূপ দুষ্কর্ম্ম আমার দ্বারা কৃত হয় নি।

সেকালে যখন উজ্জয়িনী নগরী বহুদূর-বিস্তৃত ছিল—আর তার প্রমাণও এখনো যখন দেখতে পাচ্ছি, তখন নানা দেবায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো;—এখন সমস্ত সহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, আর তারই মধ্যে যাঁরা এখনো মাথা তুলে বিদ্যমান আছেন, তাঁরা এই বিস্তীর্ণ শ্মশান-ক্ষেত্রের দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছেন! সুতরাং এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে হলে পাঁচ ছয় মাইল যেতে হয়। না আছে ঘর বাড়ী, না আছে তেমন দোকান-পাট; আর কালিদাসের সে সব নৃত্যপরা বিম্বাধরা পুরাঙ্গনাগণ এখন ত আকাশ কুসুম। সুতরাং মঙ্গলেশ্বর থেকে বেরিয়ে আর চার-পাঁচ মাইল না গেলে সিদ্ধনাথ ও পাতালেশ্বরের দর্শন পাওয়া যাবে না। টঙ্গা তখন সেই দিকেই চললো। প্রায় তিন মাইল গিয়ে আমরা সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হলাম। স্থানটি সত্যসত্যই সিদ্ধাশ্রম! দৃশ্য শোভায় সিদ্ধাশ্রমের মত স্থান ভারতবর্ষে অতি কমই আছে। এই সিদ্ধাশ্রম সিদ্ধবটের জন্য প্রসিদ্ধ। ভৈরবগড়ে এই সিদ্ধবট। কেল্লার দক্ষিণে নদীর দিকে যাবার রাস্তার পাশে পঞ্চ পাণ্ডবের মন্দির, আর তার পাশেই মারুতি মন্দির। শ্রীমান সরকার দৌলত রাও সিন্ধিয়া নরেশ এই মন্দির স্থাপন করেন। এর কিছু দূরেই সরদার কিবেনজী এক ধর্ম্মশালা তৈরী করে দিয়েছেন। একশ বছরের উপর এই ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হয়েছে।

এই ধর্ম্মশালার নীচে পাতালেশ্বর নামে মহাদেব আছেন। এই মহাদেবের চত্বর শ্বেত-পাথরে বাঁধান। মহাদেবের পশ্চাতে এক গুহা আছে—এর মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণু আছেন। এই বিষ্ণু-মূর্ত্তির পশ্চাতে এক গুহা ছিল বলে প্রবাদ আছে—তা আর এখন দেখা যায় না। এই ধর্ম্মশালায় সব সময় লোকসমাগম হয়। এখানে মহাদেবের মন্দির পাথরে তৈরী। এই মন্দিরের পার্শ্বেই বটবৃক্ষ আছে; সেই বৃক্ষই সিদ্ধবট নামে খ্যাত। মহাদেব মন্দিরের আশেপাশে অনেক ছোট ছোট মন্দির আছে। রামচন্দ্র রায় নামে এক মহাশয় ব্যক্তি এইখানে একটি সুন্দর ঘাট তৈরী করে দিয়ে যাত্রীদের মহৎ উপকার করে গেছেন। প্রবাদ আছে, ভারতবর্ষে সাড়ে-তিনটি অক্ষয়-বট আছে। প্রথম প্রয়াগে অক্ষয়-বট, দ্বিতীয় নাসিকে পঞ্চবট, তৃতীয় উজ্জয়িনীর সিদ্ধবট; অবশিষ্ট আধখানি গয়ার গয়াবট। এই সিদ্ধবটের ছায়ায় মহাদেব ও গণপতি মূর্ত্তি আছে। দেবতাদের চত্বর সাদা-কাল পাথরে বাঁধান। বটের নীচে নদীতে প্রচুর জল। এই স্থানে স্নান করলে সব পাপই ক্ষয় হয় ব'লে পাণ্ডারা শুনিয়ে থাকেন। হর-চতুর্দ্দশীতে এখানে স্নান করলে নাকি সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধ হয়। বৈশাখী পূর্ণিমাতে এখানে একটা মেলা হয়। দ্বিতীয় মেলা হয় পিতৃপক্ষের অমাবস্যায়, তৃতীয় মেলা হয় বৈকুণ্ঠ-চতুর্দ্দশীর দিন। তৃতীয় মেলাটাই তিন দিন স্থায়ী হয় বলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধবটের নীচেই শিপ্রা নদী। প্রতিদিন শত সহস্র যাত্রী এখানে স্নান পূজা করে থাকেন। ঘাটে অসংখ্য বড় বড় মাছ খেলা করছে দেখা গেল। যাত্রীরা মুড়ী, কড়াই-ভাজা মাছকে খাওয়ায়। আমরা উপর থেকে মুড়ি কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম।

এইবার লম্বা পাড়ি দিতে হবে। দক্ষিণ-দিকের দেবায়তন যেগুলি এখনও মাথা খাড়া করে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান কয়টী দর্শন করা

করব, উপায় নেই ; মধ্যাহ্ণ দুইটার সময় রেলে চাপতেই হবে ; সুতরাং এই অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উজ্জয়িনী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'তেই হবে। এবার তাই যেতে হবে উজ্জয়িনীর উত্তরে ভর্ত্তৃহরির গুহা দেখতে।

হরসিদ্ধি

টঙ্গাওয়ালা তথনই তার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে—আলোর দরকার। পথের মধ্যেই অতি ক্ষুদ্র কয়েকখানি দোকান পাওয়া গেল। তারই এক দোকান থেকে [illegible]

ছোট বাতি কিনে নেওয়া গেল। যাত্রীরা সর্ব্বদাই এই গুহা দেখতে যাবার সময় এই সকল বাতি কিনে নিয়ে যায়; সেই জন্য এখানে বাতির অভাব হয় না। আমরা যখন গুহার মুখ থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে, তখনই টঙ্গাওয়ালা হুকুম করল, ঐখানেই সকলকে নামতে হবে, টঙ্গা আর এগুতে পারবে না; সেখান থেকে উঁচু পাহাড়ের উৎরাই নেমে গুহামুখে যেতে হবে। হরিদাসবাবুও বল্লেন, ওদিক পর্য্যন্ত গাড়ী যেতে পারে না। কি করা যায়, এমন প্রসিদ্ধ গুহা না দেখে ফিরে যাওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না। বেলা তখন প্রায় এগারটা। সেই প্রাতঃকালে সাড়ে সাতটা থেকে সেই এগারটা পর্য্যন্ত টঙ্গায় ভ্রমণ, আর মধ্যে মধ্যে নেমে অনেক স্থলেই প্রায় মাইলটাক পদব্রজে গমন। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তা ব'লে যা যা দেখবার, তা ত্যাগ করা যায় না। অগত্যা পদব্রজই সই!

উজ্জয়িনীর উত্তরে শিপ্রার তীরে মাইলখানেক দূরে ভর্তৃহরি গুহার অবস্থান। এই গুহার দক্ষিণে রণমুক্তেশ্বর, পশ্চিমে শিপ্রা, উত্তরে কালিকা মাতা। গুহায় যাবার পথ দক্ষিণদিকে। প্রথমে ভর্তৃহরির গুরু গোরক্ষনাথের সমাধি-স্থান দেখা যায়। দক্ষিণমুখী হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে ছোট ছোট দুটি দরজা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রথমটি পাতালেশ্বরে যাবার গুহাপথ, অন্য দরজা ভর্তৃহরির গুহার পথ। ঐ পথে গেলেই প্রথমে এক চত্বরে পৌঁছান যায়। চত্বরের পশ্চিমে একটি ছোট দরজা আছে; সেইটাই হচ্ছে গুহার রাস্তা। ঐ রাস্তার শেষে গুহার পূর্ব্ব দিকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে একটি বড় চত্বর পাওয়া যায়; তার পরেই ভর্তৃহরির সমাধি। সমাধির দক্ষিণে গোপীচন্দ্রের মূর্ত্তি আছে। পশ্চিমে কাশী যাবার গুহাপথ ছিল; এখন নাকি সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। প্রবাদ আছে যে, এই গুহামধ্য থেকে চার ধামে যাবার পথ ছিলো। যাঁর গুহার কথা, সাধন

যে সব প্রবাদ আছে, তা থেকে সঠিক সংবাদ জ্ঞাত হবার কোন উপায়ই নেই। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, ভর্তৃহরির মত জ্ঞানী সাধক খুবই বিরল

চব্বিশ খাম্বা

ছিল। তাঁর ব্যাকরণের টীকা, নীতিশতক, বৈরাগ্যশতক, শৃঙ্গারশতক বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভর্তৃহরির বৈরাগ্য অবলম্বন সম্বন্ধে যেমন নানা কথা

শুনা যায়, তেমনই জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধেও নানা প্রবাদ আছে। দুই-একটা প্রবাদের কথা বলা যাক্।

এক সময় এক তপস্বী শিপ্রায় স্নান করতে গিয়ে এক অপ্সরাকে দেখে মুগ্ধ হন। জ্ঞানী তপস্বীও মনশ্চাঞ্চল্য রোধ করতে অক্ষম হওয়ায় তাঁর শরীরের তেজাংশ একটি ভস্তরি মধ্যে রেখে, শিপ্রায় স্নান করে আবার তপস্যায় চলে যান। এদিকে উজ্জয়িনী-রাজ স্নানার্থে শিপ্রায় এসে এক বালকের রোদন-ধ্বনি শুনতে পেয়ে, অনুসন্ধানে দেখতে পেলেন যে ভস্তরি মধ্যে একটি সদ্যজাত সুরূপ শিশু কাঁদছে। রাজা তখন তাকে সাদরে ঘরে এনে লালন-পালন করতে লাগ্‌লেন। তার নাম দিলেন ভর্তৃহরি। পরে এই ভর্তৃহরিই রাজা হন। এইরূপ আরও অনেক আজগুবি কথা ভর্তৃহরির জন্ম সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। আর তাঁর বৈরাগ্য-কথা যে সব শুনা যায়, তার মধ্যে বিভিন্ন দুটি বিবরণ নিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করবার ভার পাঠকের উপর। আমরা সেখানে যা শুনেছিলাম, তাই লিপিবদ্ধ ক'রে খালাস।

বিপুল তপস্যার পর কোন এক ঋষি দেবানুগ্রহে এক অমৃতফল প্রাপ্ত হন। ভর্তৃহরির মত সদ্‌গুণসম্পন্ন রাজার মঙ্গল কামনা ক'রে তপস্বী সেই ফল রাজাকে দান করেন। রাজা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা রাণীকে সেই অমৃতফল দেন। রাণী আবার তাঁর প্রিয়পাত্র অন্য একজনকে সেই ফল দেন;—সে আবার তাঁর প্রিয়পাত্রীকে সেই অমৃতফল দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেন। কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায় সেই নারী বিশেষ রাজভক্ত ছিল বলেই নানা উপঢৌকনের সঙ্গে রাজাকে সেই অমৃতফল দিয়ে, তাঁকে বিশেষ করে বলেন যে, এ অমৃতফল ভক্ষণের আপনিই একমাত্র অধিকারী। এর গুণে আপনি দীর্ঘজীবী ও অশেষ গুণান্বিত

রাজা সেই নাগরিকার কথা শুনে ও তাঁর কাছ থেকে তপস্যা-লব্ধ অমৃতফল পেয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করে জানলেন যে, তাঁর অপরিসীম বিশ্বাস ও ভালবাসার পাত্রী মহারাণীরই যখন এমন আচরণ, তখন আর এ অসার সংসারে থাকার প্রয়োজন কি ? বৈরাগ্য তাঁকে এমন ভাবে
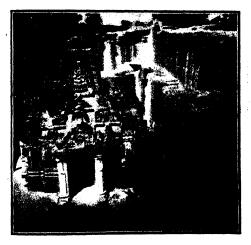
ভর্তৃহর গুহা

সেই মুহূর্ত্তে আশ্রয় করল যে, কোনও প্রলোভনই তাঁকে রাজসিংহাসনে আকৃষ্ট করতে পারল না ; তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করলেন।

দ্বিতীয় প্রবাদ এই—ভর্তৃহরির রাণীর উপর প্রবল আসক্তি ছিল। রাণীও পরম পতিব্রতা ছিলেন। একদিন রাজা উপহাসচ্ছলে রাণীকে বলেন যে, আমি মারা গেলে তুমি কি করবে ? রাণী বললেন—প্রত্যেক

সতী যা করে থাকে আমি তাই করবো—সহমৃতা হবার সৌভাগ্য হতে আমাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। রাজা এই কথার যাথার্থ্য পরীক্ষা করবার জন্য মনে মনে এক ফন্দী আঁটলেন। তিনি একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে একটি বাঘ মেরে সেই বাঘের রক্তে নিজ পরিচ্ছদ সিক্ত করে এক পার্শ্বরক্ষীকে দিয়ে রাণীর নিকট সংবাদ পাঠালেন, রাজাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে, তাঁর এই পরিচ্ছদই তার নিদর্শন। রাণী এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই রাজপরিচ্ছদ-সহ সহমৃতা হলেন। এই দুঃসংবাদ রাজার নিকট পৌছিলে তিনি পাগলের মত হয়ে শ্মশানে ছুটে এসে দেখলেন, রাণীর দেহ ভস্মে পরিণত হয়েছে। ভর্তৃহরি নিজের মনকে কোনও প্রকারে শান্ত করতে না পেরে সেই শ্মশান আশ্রয় করেই দিবারাত্রি রাণীর জন্য কাঁদতে থাকেন। এদিকে রাজগুরু গোরক্ষনাথ রাজার উপর দয়াপরবশ হয়ে পাগল সেজে এক মাটীর কলসী নিয়ে খেলতে খেলতে এসে, ভর্তৃহরির সম্মুখে দৈবাৎ যেন কলসী পড়ে ভেঙ্গে গেল, এমন ভাবে সেই কলসী ভেঙ্গে ফেলে, কাঁদতে লাগলেন। ভর্তৃহরি মাটীর কলসীর জন্য কাঁদতে দেখে সেই পাগলকে বল্লেন—"ওরে বর্ব্বর, একটি মাটীর হাঁড়ীর জন্য কেঁদে কি করবি, তার চেয়ে মাটীর কলসী বাজারে হাজার হাজার আছে, কিনে নিয়ে তোর খেয়াল চরিতার্থ কর গিয়ে।" পাগল বল্লেন "তবে তুই রাণী রাণী করে কেঁদে মরছিস্ কেন? আমার কাছে তোর রাণীর মত হাজার রাণী আছে; তাই দেখে তুই তোর খেয়াল মিটো।" এই বলে পাগলবেশী গোরক্ষনাথ যোগবলে রাজা ভর্তৃহরিকে হাজার রাণী দেখান। তখন রাজা সেই সাধুর পায়ে পড়ে দীক্ষা-প্রার্থী হন। মহাত্মা গোরক্ষনাথ তখন শোকাকুল রাজাকে যোগমার্গে যাবার মত ব্যবস্থা করে দিয়ে তাঁকে শিষ্যত্বের

কালী মন্দির

সুকৃতি ও সাধন-বলে অতুল যোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েছিলেন। কাহিনী এমন না হ'লে লাগ-সই হয় না। রাজা ভর্তৃহরি সম্বন্ধে এমন কাহিনী অনেক আছে; সে সব ব'লে কাজ নেই; এই দুইটাই যথেষ্ট।

এই ভর্তৃহরি গুহার মধ্যে বাতি জ্বালিয়ে যা কিছু দেখবার, সে সকল দেখে আমরা যখন বাইরে এলাম, তখন বারটা বাজতে বিলম্ব নেই। কিন্তু, এতদূর এসে কালিকা মূর্ত্তি না দেখে যাই কেমন করে? কাজেই চল, মা জয় কালী বলে! কিছুক্ষণ পরেই কালিকাদেবীর মন্দিরের নিকট টঙ্গা উপস্থিত। মহাকালাই এখানে কালিকা দেবী নামে খ্যাতা। তাঁর মন্দির উজ্জয়িনী সহর থেকে এক মাইল দূরে গড়পারে অবস্থিত। কালিকা মন্দিরের সম্পূর্ণ অংশই পাথরে তৈরী ও বহু প্রাচীন। মন্দিরটি দর্শনযোগ্য। এর চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যাবলী দেখ্‌লে মনে হয় যেন দেবী জাগ্রত অবস্থায় এখানে সব সময় অবস্থান করে দেশকাল সুপবিত্র করছেন। কোন্ সময়ে এখানে কি উপলক্ষে কে এই দেবী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে এবং সে সব সম্ভব অসম্ভব নানা কথা থেকে কিছুই ঠিক করা যায় না। তবে লিঙ্গ-পুরাণে এই দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে:—

শ্রীরামচন্দ্র রাবণ-বধের পর বিশ্রাম গ্রহণ করবার জন্য কিছুদিন উজ্জয়িনীর হরসিদ্ধির পশ্চিমে অবস্থান করেন। কাজেই রামভক্ত মারুতি রুদ্রসাগরে তাঁর শয়নের স্থান ঠিক করে তাঁর বিরাট দেহ বিস্তার করে সুখ-নিদ্রায় দিন কাটাতে লাগলেন। এই সময় কালী ক্ষুধায় কাতর হয়ে তাঁর আহার্য্য দ্রব্যের অনুসন্ধানে এসে ভুল করে মারুতিকে দেখা দিয়ে ফেলতেই হনুমান আপন বদন ব্যাদান করে অপরূপ রুদ্রমূর্ত্তি দেখাতেই দুর্জ্জনকে ত্যাগ করাই উচিত বিবেচনায় কালিকা দেবী সে স্থান ত্যাগ করে দ্রুতবেগে যেতে লাগলেন। খানিকটা দূর যাবার পর

কালীয়াদহ প্যালেস
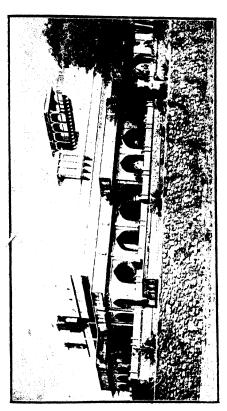
এই কালিকা মন্দিরের নিকট তাঁর অঙ্গভূষা স্থানভ্রষ্ট হয়ে প'ড়ে এক কালিকা মূর্ত্তি ধারণ করেন। এই মূর্ত্তিই কালিকা দেবী নামে সেই যুগ হতে অভিহিত হয়ে আস্‌ছেন। এখানে বলিদান প্রথা প্রচলিত আছে। এই মন্দিরের সম্মুখে সুগভীর এক তড়াগ আছে। এমন বিশাল জলাশয় উজ্জয়িনী সহরে আর দেখা যায় না। এর পার্শ্বেই বলিদানের স্থান। তার পাশের সিঁড়ি দিয়ে ভিতরে গেলেই দেখা যায় যে, ছয় হাত চওড়া ও পঁয়ত্রিশ হাত লম্বা দালান দুই দিকে আছে। এর সম্মুখ দিয়ে গেলেই দেবীস্থান বা বেদীতে দেবীকে দেখা যায়। ভিতরে কালিকা দেবীর মূর্ত্তি ও চামুণ্ডা দেবী ও নব গিরীশ দেবতা আছেন। কালিকা মন্দিরের সম্মুখে এক নিম্ববৃক্ষের নীচে বিন্দুবাসিনীর এক স্থান আছে। মন্দিরের পশ্চাতে বাহিরের দিকে স্থির বিনায়কের একটি মন্দির আছে। এই মন্দির শ্রীমন্ত সরদার তৈরি করেন। এখানেও চৌরাশী মহাদেবের এক মহাদেব সিংহেশ্বর নামে অবস্থান করছেন। এরই পশ্চাতে মারুতির মন্দিরে যাবার পথ। এই পথটির মধ্যে মধ্যে সীতাফলের বৃক্ষে কুঞ্জ গঠিত হয়ে আছে। পথের পার্শ্বে একটি কূয়া আছে। সীতাফলের কুঞ্জ পথের পার্শ্বে এমন সুসজ্জিত যে, দেখলে মনে হয় যেন কোনও রমণীয় উদ্যান-বাড়ীর মধ্যে এসে পড়েছি। মহাকবি কালিদাস এই কালিকা মন্দিরে সাধনা করেই বিদ্যালাভ করে সিদ্ধি পেয়েছিলেন ব'লে প্রসিদ্ধি আছে। নব-রাত্রির সময়ে এখানে এক বিরাট মেলা বসে ও বৈশাখী অষ্টমী পর্য্যন্ত সে মেলা থাকে।

কালিকা দেবীর মন্দির থেকে বেরিয়ে শিপ্রার ঘাটে এসে যখন বসা গেল, তখন বেলা একটা বেজে গিয়েছে। যদি দুইটার ট্রেণেই ইন্দোর ফিরে যেতে হয়, তা হলে হরিদাস বাবুর বাড়ী গিয়ে স্নান-আহারের আশা ত্যাগ করতে হয়। হরিদাস বাবু বল্লেন—আমার বাড়ীতে স্নান আহার

কালীদহ মহল

না হয় নাই করলেন ; আমার আয়োজন আগ্রহ না হয় বৃথাই হোক্ ; কিন্তু আপনারা উজ্জয়িনীতে এসে শ্রীশ্রীমহাকাল ও শ্রীশ্রীগোপাল দেবকে দর্শন না করে দেশে ফিরে যাবেন কি করে ? লোকে এ কথা শুনলে আপনাদের ধিক্কার দেবে। বিশেষ আপনারা হিন্দুর ছেলে ; মনে মানুন আর না মানুন, বাইরে হিন্দুর প্রসিদ্ধ দেবদেবীর উপর ভক্তি প্রদর্শন করা আপনাদের পিতৃপুরুষের নাম স্মরণ করেও কর্ত্তব্য। অতএব আমি বলি কি, এখন আমার বাসায় চলুন ; সেখানে স্নানাহার শেষ করে, অপরাহ্ণে শ্রীগোপাল, মহাকাল, ও মানমন্দির দেখে সন্ধ্যার পর আমার বাড়ীতে আবার আসুন। রাত্রি বারটায় যে ট্রেণ আছে, তাতে উঠ্‌লে দুটোর সময় ইন্দোরে পৌছবেন ; তার দুঘণ্টা পরে রাত চারটায় মাণ্ডু যাত্রা করবেন। আর জানেন তো মহাকবি কালিদাস বলে গিয়েছেন,—

অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকাল মাসাদ্যকালে
স্থাতব্যং তে নয়ন বিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।

মহাকবির এ আদেশ তো আপনারা উপেক্ষা করতে পারবেন না ; বিশেষ আপনারা যখন তাঁকে বাঙ্গালী কবি বলে দাবী করতে বসেছেন।

সুতরাং এর উপর আর কথা নাই। আমাদের সঙ্গী বড় বড় বাক্যবাগীশেরাও হরিদাস বাবুর এই যুক্তিপূর্ণ কথার উত্তর দিতে না পেরে মৌন অবলম্বন করলেন। এবং সেই মৌনকেই সম্মতি-লক্ষণ মনে করে হরিদাস বাবু টঙ্গাওয়ালাদিগকে তাঁর বাড়ীর দিকে যেতে আজ্ঞা দিলেন। সেখানে পৌছে, স্নানাহার শেষ করতে প্রায় তিনটা বেজে গেল। স্কুল-মাষ্টারের বাড়ী হলেও আয়োজনটা বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনাকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। পাঠকগণের কেউ যদি উজ্জয়িনী বেড়াতে যান, আর হরিদাস বাবু যদি সে সংবাদ কোন রকমে পান, তা হলে আমাদের
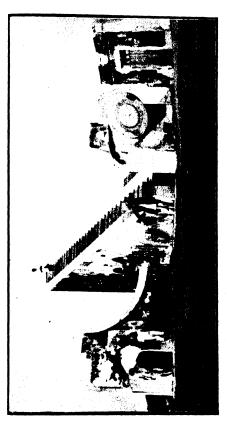
মানমন্দির

অপরাহ্নে বেরিয়ে প্রথমেই শ্রীগোপালের মন্দিরে যাওয়া গেল। মন্দিরের দ্বার বন্ধ ; গোপালজীর তখনও নিদ্রা-ভঙ্গ হয় নাই ; কাজেই তখন তিনি আর আমাদের দর্শন পেলেন না। সেখান থেকে বেরিয়ে প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করে মানমন্দিরে উপস্থিত হলাম। জয়পুরের মহারাজা এই মানমন্দির প্রথমে নির্ম্মাণ করেন ; তার পর কাশী প্রভৃতি স্থানে এই ধরণের মানমন্দির নির্ম্মাণ করে দেন। দেখলাম মানমন্দিরটি অতি যত্নের সঙ্গে রক্ষিত হয়েছে। আমাদের সঙ্গে তিন চারজন বড় বড় অধ্যাপক ছিলেন ; তাঁদের অনেকেই জ্যোতিষের আলোচনা করে থাবেন। তাঁরা সেই মানমন্দির থেকে বেরুতে চাইলেন না। তাঁরা বল্লেন, কালিদাসের আদেশ, সন্ধ্যাবেলায় মহাকালের মন্দিরে যেতে হবে। কিন্তু বন্ধুরা ভুলে গেলেন যে, কালিদাসের আমলে সন্ধ্যাবেলায় মহাকালের মন্দিরে গেলে অন্য রকমে নয়ন সার্থক হোত, এখন আর তা হবার যো নাই। এখন মহাকালের সন্ধ্যা-আরতি দেখে অন্ধকারেই ফিরতে হবে।

সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানমন্দিরে কাটিয়ে আমরা মহাকালের মন্দির-দ্বারে এসে উপস্থিত হলাম। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ মধ্যে এই মহাকাল অন্যতম। এঁর মন্দিরের তলঘর (পাতালপুরী) সাদা পাথরে বাঁধান। তারই একটী গুহায় এঁর অবস্থান। মহাকাল, গণপতি, পার্ব্বতী, ষড়ানন প্রভৃতি দেববৃন্দে পরিবৃত হয়ে এই গুহায় আছেন। এই স্থানের সম্মুখ দিয়ে একটা বড় নদী সব সময় স্বচ্ছ সলিলে নিজ বিপুল অঙ্গ শোভিত করে মৃদু মন্দ তরঙ্গে কলকল রবে ভাবে বিভোর হয়ে রয়েছেন ও ভক্তদের ডেকে বলছেন, তোমরাও আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে মহাকালের স্তব কর গো ! এই পাতালপুরীতে প্রকাণ্ড একটী পিতলের দীপ দিবারাত্রি সমান ভাবে জলে ; এই দীপটিকে কখনও নিবতে

যথা কেবড়েশ্বর, বৃদ্ধকালেশ্বর, (যিনি আজকাল লিঙ্গপুরাণে মহাকাল বলে অভিহিত।) রুদ্রসাগরে এক, মহারাজবেড়ায় এক ও ওঁঙ্কারেশ্বর। মহাকালের পূর্ব্ব দিকে একটী নহবৎখানা আছে। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা নহবৎ বাজে। এই নহবৎখানার পাশ দিয়েই ষ্টেসনে যাবার পথ।

মহাকালের মন্দির

মহাকালের দক্ষিণে বৃদ্ধকালেশ্বর, পশ্চিমে রুদ্রসাগর ও হরসিদ্ধি, উত্তরে সরকারবাড়া। মহাকাল সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ বচন আছে যে,—

আকাশে তাড়কে লিঙ্গ, পাতালে হটকেশ্বরম্

মৃত্যুলোকে মহাকালে লিঙ্গত্রয় নমোঽস্তুতে।

মহাকালের মন্দির খুব প্রাচীন। কিন্তু, দেখে দেড়শ বছরের আগের বলে মনে হয় না। অনেকে অনুমান করেন যে, ভীমরাজ পবারকের পুত্র উদয়াদিত্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মুসলমান-ভূপতির অকীর্ত্তিও এর উপর দিয়ে নির্ব্বিবাদে বয়ে গেছে—তারও নিদর্শন বহু বহু পাওয়া যায়; এবং অনেকে বলেন যে, সম্রাট অল্‌তমশ মহাকালের উপর চড়াও হয়ে তাঁর দেবালয় ও অন্যান্য মন্দির ভূমিসাৎ ক'রে দেন। এই সংহার থেকে মহাকালকে কতকটা উদ্ধার ক'রে গেছেন সিন্ধিয়ার রাণীজী দীবান ও রামচন্দ্র বাবা শেনবীণ। যে সব মন্দির মুসলমানেরা নষ্ট করে ফেলেছিল,তার সবই প্রায়ই এঁরা নূতন করে গ'ড়ে দিয়ে অবন্তী-মাহাত্ম্য রক্ষা করবার চেষ্টা করে গেছেন। মহাকালের অসীম অনুগ্রহে মন্দিরের পার্শ্বে চৌরশী কুণ্ড কোটীতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ একটী তীর্থকুণ্ড আছে। বর্ষায় এই কুণ্ডের জল বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে ব'লে শোনা গেল। পাণ্ডারা বলেন কোটীতীর্থ দর্শন-স্পর্শনে সর্ব্বপাপ মোচন হয়। এই ধারণায় বহু লোকের সমাগমে এই তীর্থ সব সময়ই জনবহুল হয়ে আছে। আরও প্রবাদ আছে যে, এই কুণ্ডের স্নিগ্ধ জলে মহাকাল নিজেও স্নান ক'রে থাকেন।

শ্রীমন্ত মহারাজ সিন্ধে, হোলকার মহারাজ, এবং পন্বার সরকার এই তিন রাজ্যের তরফ থেকে মহাকালের সেবার বন্দোবস্ত আছে। এই বন্দোবস্তের জন্যই মহাকালের ত্রিকালপূজা হয়। প্রাতঃকালে ভস্মপূজা, দ্বিপ্রহরে ভোগপূজা, আর সন্ধ্যায় পুষ্পপূজা হয়ে থাকে। মহাকালের পূজার নৈবেদ্য পূজারী গোস্বামীরাই নিয়ে থাকেন। মহাশিবরাত্রির সময় এই মহাকালদেবের নিকট বহু ভক্ত নরনারীর সমাগমে স্থানটি মনোরম দৃশ্য ধারণ করে এবং সেই উপলক্ষে তিন-দিনব্যাপী মেলা হয়। আর এই তিন দিনই নূতন নূতন সজ্জায় মহাকালকে ভূষিত করে অষ্ট

গোপাল মন্দির
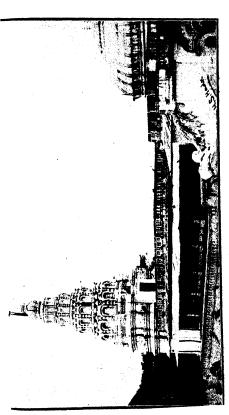
শ্রাবণ মাসের চারি সোমবারে চারি প্রকারের সেবা উপলক্ষে সমাগত ভক্ত হৃদয়ে যে ভাবে আনন্দ প্রকাশ পায়, তা বর্ণনা করা যায় না।

সন্ধ্যার পর এই পবিত্র মন্দির-ভূমি ত্যাগ করে পথের মধ্যে শ্রীগোপালজি দর্শন করে হরিদাস বাবুর বাড়ীতে এসে হাত পা ছড়িয়ে বসা গেল। তখন আর এক বিভ্রাট; হরিদাস বাবু বল্‌ছেন, এই টঙ্গা পাঁচখানির সারাদিনের ভাড়া তাঁর দেয়। আমাদের সঙ্গীরা সে কথায় কিছুতেই সম্মত হতে চাচ্ছেন না। সে কি কথা মাষ্টার বাবু? টঙ্গাভাড়া আমরা দেব। আপনি কিছুতেই দিতে পারবেন না। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর এই সিদ্ধান্ত হোলো যে, টঙ্গাওয়ালাদের বিদায় আমরাই করব; আর উজ্জয়িনী থেকে ইন্দোর ফিরবার সবাইকার রেলের টিকিট হরিদাস বাবু করে দেবেন এবং সে টিকিট একশ-এগার নম্বর গাড়ীর। তখন চা-পান, জলযোগ ও বিশ্রাম। পূর্ব্বদিন সারারাত্রি জাগরণ গিয়েছে, তার পর এই সারাদিন ভ্রমণ, সুমুখের রাত্রিটাও জাগরণ!

এই স্থানে শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটু সামান্য পরিচয় না দিলে উজ্জয়িনীর কথাই অসমাপ্ত থেকে যাবে। পূর্ব্বেই বলেছি, উজ্জয়িনীতে তিনিই হচ্চেন একমেবাদ্বিতীয়ম্ বাঙ্গালী। তিনি পূর্ব্বে গোয়ালিয়র স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কয়েক বৎসর হোলো উজ্জয়িনী স্কুলে বদলী হয়েছেন। এখানে এসে তিনি এক নূতন প্রতিষ্ঠান খুলে বস্‌লেন। ইংরাজীতে যাকে Coaching class বলে, তাই আর কি; অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য ছেলে তৈরীর ক্লাস খুল্‌বার সঙ্কল্প তাঁর মাথায় এসেছিল। তাঁরই স্কুলের কয়েকটি ছেলে নিয়ে তিনি প্রথমে সামান্য ভাবে এই ক্লাস খোলেন। এখন এই কোচিং বিদ্যালয়ে পাঁচ ছয় শত ছাত্র। বাঙ্গালী ছাড়া অন্যান্য সকল প্রদেশ থেকেই দলে দলে

এসে জুটেছে। প্রবেশিকা ও আই-এ পরীক্ষার জন্যই হরিদাস বাবু ছাত্র তৈরী করেন। নাগপুর, এলাহাবাদ ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এই বিদ্যানিকেতনের ছাত্রদের তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেবার অধিকার প্রদান করেছেন। হরিদাসবাবু চার পাঁচটা বড় বড় বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন; ছাত্রেরা সেখানে থাকে। এতগুলি ছাত্রকে একেলা পড়ান অসম্ভব; তাই তিনি তিনজন বাঙ্গালী ও কয়েকজন ঐ দেশী শিক্ষক নিযুক্ত করেছেন। আমরা যখন গিয়েছিলাম, তখন তিনি দুই বৎসরের ছুটী নিয়ে তাঁর এই বিদ্যা-নিকেতনের পরিচালনায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তিনি বল্লেন, তাঁর বিদায়কাল শেষ হ'লে ষ্টেটের নিয়ম অনুসারে তিনি অবসর-বৃত্তির জন্য আবেদন করবেন এবং সে বৃত্তি পাবারও আশা আছে। তাঁর স্কুলে খরচ-খরচা বাদে যা আয় হবে এবং তাঁর পেন্সন, এই দুইটায় জড়িয়ে তাঁর বেশ চলে যাবে। আমাদের একজন সঙ্গী বল্লেন, বেশ চলে যাবে, যদি আমাদের মতন দল বেঁধে অতিথি বছরে দশ পনর বার না আসে। হরিদাস বাবু হাসতে হাসতে বল্লেন, আপনাদের আশীর্ব্বাদে তাতেও আট্‌কাবে না।

তার পর আর কি? রাত দশটার সময় মধ্যাহ্নের ব্যাপারের দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। তার পর এগারটার পরেই ষ্টেসনে গমন, শীতে কম্পন, পথে গাড়ী পরিবর্ত্তন, দুইটার সময় ইন্দোরে পুনরাগমন। স্কুলের বাড়ীতে পৌছিতে রাত আড়াইটে, কোন রকমে লেপের মধ্যে প্রবেশ। ভোর চারটার সময়ই ইন্দোর সাহিত্য-সম্মেলনের সদাজাগ্রত সম্পাদক শ্রীমান প্রমথ ভায়ার আহ্বান "দাদা, উঠুন, রাত চারটা বেজে গেছে; যান প্রস্তুত। এখনই মাণ্ডু যেতে হবে।" তথাস্তু!

মাণ্ডু

এবার মাণ্ডুর কথা বলতে হবে। ইন্দোরে যাবার আগেই প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলনের কর্ম্মী মহাশয়গণ একখানি পত্র ছাপিয়ে সকলের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাতে তাঁরা লিখেছিলেন যে, যাঁরা ইন্দোরের সাহিত্য-সম্মেলনে যাবেন, তাঁরা যদি মাণ্ডু দেখতে যেতে চান, তা হ'লে সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পূর্ব্বেই জানাবেন, কারণ মাণ্ডু ইন্দোর থেকে যাট মাইল দূরে অবস্থিত। আগে থাকতে যান-বাহনের ব্যবস্থা না করলে মাণ্ডু দেখা সম্ভবপর হবে না। মাণ্ডুর ইতিহাসও তাঁরা অতি সংক্ষেপে জানিয়েছিলেন। মাণ্ডু দেখতে যেতে হ'লে গাড়ীভাড়া হিসাবে প্রত্যেককে পাঁচ টাকা দিতে হবে, এ কথাও তাঁরা লিখেছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে আমরা কলিকাতা থেকেই লিখে পাঠিয়েছিলাম যে, আমরা তিনজন মাণ্ডু দেখতে যাব এবং তার জন্য যে যান-বাহনের ব্যবস্থা করতে হয়, তা যেন প্রমথবাবু করে রাখেন।

ইন্দোরে গিয়ে প্রমথবাবুকে জানালাম যে আমাদের একজন অর্থাৎ শ্রীমান সুধাংশুশেখর ভায়া আসেন নাই, সুতরাং আমাদের জন্য দুইটা 'সিট' যেন রিজার্ভ করা হয়—শ্রীমান নরেন্দ্র আর আমি যাব; আর তখনই ভাড়া হিসাবে দশ টাকা দিয়ে দিলাম। সেখানেই শুনলাম যে, ৩০ শে ডিসেম্বর রবিবার অতি প্রত্যূষে মাণ্ডু যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ২৯ শে তারিখটায় ইন্দোরে কোন কাজই ছিল না; এদিকে আমাদেরও সময় কম। সেইজন্য আমরা ২৮ শে শুক্রবার রাত্রিতেই উজ্জয়িনী যাবার

আস্‌ব, আর পরদিন প্রত্যূষে মাণ্ডু যাব। তারপর উজ্জয়িনীতে বিলম্ব হয়ে হাওয়ায় আমরা সেদিন রাত দুইটার সময় ইন্দোরে ফিরে আসি, আর রাত না পোহাতেই মাণ্ডু যাবার জন্য প্রস্তুত হই ; এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। তাই, ভোর চারটে বাজতে না বাজতেই যখন সদা-জাগ্রত প্রমথবাবু এসে ডাক্‌লেন "দাদা উঠুন, এখনই মাণ্ডু যেতে হবে," তখন বাক্যব্যয় না করে উঠে পড়লাম এবং সেই দারুণ শীতের মধ্যে তন্দ্রা-জড়িত অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি আমাদের জন্য একখানি 'বাস' দাঁড়িয়ে আছে। এ ত্রিশে ডিসেম্বর ভোর-বেলার কথা।

একে ভয়ানক শীত, তাতে সারারাত্রি নিদ্রা হয় নাই ; বাসের মধ্যে আর কে কে আছেন, সেই অন্ধকারে তা বুঝতে পারলাম না। বাসে উঠে এক পাশে ব'সে পড়লাম। পাঁচটা বাজ্‌বার পূর্ব্বেই গাড়ী ছেড়ে দিল। মনে করেছিলাম, গাড়ীর মধ্যে একটু চোক বুঁজে বস্‌ব ; কিন্তু তা কি হবার যো আছে,—যে ঝাকুনি, তাতে মরা মানুষও জেগে ওঠে।

যেতে হবে ষাট মাইল পথ। মাইল দুই তিন যাবার পরই পূর্ব্বদিক একটু ফরসা হোলো। তখন দেখ্‌লাম 'বাসে'র আরোহী চোদ্দ জন। এই চোদ্দ জনের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন ; তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার গুপ্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। মণীন্দ্রবাবুও যে আমাদের সঙ্গী, সে কথা না বল্‌লেও চলে।

এই ত আমরা চোদ্দ জন মাত্র যাত্রী ; কিন্তু শুনেছিলাম আরও অনেকে যাবেন। তাঁরা কোথায়? আমাদের কেদার দাদা (শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) ও তাঁর সঙ্গী শ্রীমান সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীরও যে মাণ্ডু দেখ্‌তে যাওয়ার কথা ছিল ; তাঁরা কৈ? তখন জান্‌তে পারা গেল যে, পূর্ব্বদিন অর্থাৎ ২৯ শে ডিসেম্বর শনিবার মধ্যাহ্নকালেই প্রকাণ্ড একদল তিন চারখানা 'বাস' বোঝাই হ'য়ে মাণ্ডু যাত্রা করেছেন। তাঁরা

রাত্রিতে ধারের ডাক-বাংলায় থাক্‌বেন এবং খুব ভোরে সেখান থেকে যাত্রা করে মাণ্ডু দেখে দিবা দ্বিপ্রহরের মধ্যেই ইন্দোরে ফিরে আস্‌বেন। ইন্দোর থেকে ধার বা ধারা নগরী চল্লিশ মাইল; আর ধার থেকে মাণ্ডু কুড়ি মাইল।

আমরা যখন ধারে পৌঁছিলাম, তখন সাড়ে সাতটা। ডাক-বাংলার সম্মুখে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড একটা দল মাণ্ডু যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। তাঁরা সংখ্যায় প্রায় ত্রিশজন। আমাদের কেদার দাদাও সেই দলে আছেন। পাঁচ ছয়টী মহিলাকেও দেখলাম। তাঁরা সবাই পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় এসে এই ডাক বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং এখানেই রাত্রির ভোজন শেষ করেছিলেন! খুব ভোরে উঠেই তাঁদের মাণ্ডু যাবার কথা ছিল, কিন্তু প্রাতরাশের ব্যবস্থা করতে করতে তাঁদের বেলা হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা কিন্তু সে কথা স্বীকার করলেন না; কেদার দাদা বল্‌লেন "আগের দিন এগিয়ে আছি ব'লেই কি আপনাদের ফেলে মাণ্ডু যেতে পারি দাদা! তাই এতক্ষণ পথের দিকে চেয়ে আছি।" তাঁরা তখন যাত্রামুখী; সুতরাং আমাদেরও সেখানে আর অপেক্ষা করতে হোলো না। আমাদের সঙ্গী চিত্র-শিল্পী গুপ্ত মহাশয় ও তাঁর সহধর্ম্মিণী, যে 'বাসে' মহিলারা ছিলেন, তাইতে গেলেন। তাতে আমাদের ভার লাঘব হোলো না; আমরা ধার থেকে আর একটী সঙ্গী সংগ্রহ করলাম। ইনি ধার ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ঘোষ মহাশয়। ধারে তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী। সত্যবাবুকে সঙ্গী পেয়ে আমাদের ভারী সুবিধা হয়েছিল—এমন 'গাইড' কিন্তু আর কেউ পান নাই। সত্যবাবু অনেকদিন এই দেশে আছেন। তাঁকে দেখ্‌লে বাঙ্গালী ব'লেই মনে হয় না—চাল চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ সব মারাঠীর মত। তা ব'লে বাঙ্গালা

হয়েছিল ; তিনি ঐ অঞ্চলের ইতিহাস একেবারে কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলেছিলেন। দেশের ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ-পরবশ হয়েই যে তিনি এ-দেশের ইতিহাস পড়ে ফেলেছেন, তা নয়—বাধ্য হয়ে তাঁকে সমস্ত ইতিহাসের খোঁজ নিতে হয়েছিল, ধার ও মাণ্ডুর প্রত্যেক ইষ্টক-খণ্ডের সহিত পরিচিত হ'তে হয়েছিল। আমাদের মাণ্ডু যাওয়ার মাস চারেক পূর্ব্বে ভারতের বড়লাট বাহাদুর মাণ্ডুর ভগ্নাবশেষ দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁকে মাণ্ডুর ইতিহাস শোনাবার এবং সমস্ত দেখাবার ভার সত্যচরণবাবুর উপর পড়েছিল। তারই জন্য ভদ্রলোককে অনেক দিন আগে থেকে, যেখানে যা জানতে পারা সম্ভব, সে সমস্তই জানতে হয়েছিল ; আর সেই বহু ক্রোশ পরিধি-বিশিষ্ট হিংস্র-জন্তু-সমাকুল মাণ্ডুর ধ্বংসাবশেষের প্রত্যেক স্থানটী পাঁচ-সাতবার ক'রে দেখে ঠিক রাখতে হয়েছিল। সেই যে ইতিহাস পড়া হয়েছিল এবং মাণ্ডুর সব স্থান দেখা হয়েছিল, তা যেমন লাট সাহেবের কাজে লেগেছিল, তেমনি আমাদেরও কাজে লেগে গেল ; সুতরাং সত্যবাবুর মত সঙ্গী পেয়ে আমাদের খুব লাভ হয়েছিল; আমরা মাণ্ডুর অনেক স্থান দেখতে পেয়েছিলাম।

আগের দিন যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা যখন বেরিয়ে গেলেন, তখন আমরা আর অপেক্ষা ক'রে কি করব। গোপন ক'রে কাজ নেই, আমাদের একটু চা-পান করবার ইচ্ছা হয়েছিল। এ ইচ্ছারও অপরাধ নেই। সেই পূর্ব্ব-রাত্রি দশটার সময় উজ্জয়িনীতে হরিদাসবাবুর বাড়ীতে আহার ক'রে যাত্রা করেছি ; তারপর বলতে গেলে সমস্ত রাত্রি জেগে রেলে এসেছি। শেষ-রাত্রিতে ইন্দোরে পৌঁছে একটু বিশ্রামের চেষ্টা করছি, আর অমনি মাণ্ডু যাত্রা ; চা-পান ত দূরে থাক, হাতে-মুখে জল দেবারও অবসর হয় নাই। তারপর এই চল্লিশ মাইল 'বাসে' আগমন। এতে একটু চা এই শীতের মধ্যে হাতের কাছে এলে যে খুব ভাল হোতো, সে কথা বলাই

বাহুল্য। কিন্তু, যে রকম অবস্থা সেই ডাক-বাংলার তখন দেখ্‌লাম, তাতে চায়ের নাম করবারও ভরসা হোলো না; বেশ বুঝতে পারা গেল, বাংলায় যা কিছু ছিল, সব এই পূর্ব্বাগন্তুকের দল শেষ করে দিয়েছেন। কাজেই প্রাতরাশ দূরে থাক, এক পেয়ালা চাও পাওয়া গেল না। আমরা মাণ্ডুর দিকে যাত্রা করলাম।

সঙ্গী সত্যচরণবাবু বল্‌লেন যে, এখনই যাবার পথে, ধারে যা দ্রষ্টব্য আছে, তা দেখে যাওয়া ভাল; কারণ ফিরে এসে হয় ত সময় না থাকৃতে পারে, ক্লান্তিবোধও হ'তে পারে। আমাদের সঙ্গীরা কেউই এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন না, তাঁরা আর পথের মধ্যে অপেক্ষা করতে চান না। তাঁদের অসম্মতিতে বিশেষ কর্ণপাত না ক'রে সত্যবাবু আমাদের নিয়ে গেলেন ভোজ রাজার শিক্ষালয় ও ঠাকুরবাড়ী দেখাতে। শিক্ষালয় বা বিদ্যালয় এখনও ভেঙ্গে পড়ে নাই, তবে জীর্ণ হয়ে গেছে। ঠাকুরবাড়ী ঠিকই আছে; বোধ হয় এ-গুলি বর্ত্তমান ধার দরবার থেকে সংস্কৃত হয়েছে। ধারে আর যা যা দেখ্‌বার আছে ফিরবার পথে সে সব দেখা যাবে বলে, আমরা সেথান থেকে বেরিয়ে পড়লাম;— সম্মুখে তখন কুড়ি মাইল পথ, বেলা তখন আটটা বেজে গিয়েছে এবং শুনলাম এই কুড়ি মাইল সমতল পথ নয়, পাহাড়ে উঠতে হবে, চড়াই উৎরাই অনেক আছে।

এইথানে মাণ্ডুর একটু অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস না বল্‌লে চল্‌ছে না। এ ইতিহাসের গোড়ার দিকটা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ-পরিবর্ত্তনের কথা থাক্‌লেও শেষের দিকে বেশ একটা প্রণয়ঘটিত ব্যাপার আছে। সুতরাং, ইতিহাসটা মোটেই নীরস হবে না, এ ভরসা পাঠকদিগকে দিতে পারি।

ফেরিস্তা বলেন, অশোক যখন উজ্জয়িনীর রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন,

ছিল, এ কথা অনেক ঐতিহাসিক ব'লে থাকেন। যশোবন্তদেবের সময় মালব দেশের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এ কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়। তারপরই এলেন প্রমার রাজপুতগণ। এই রাজবংশের মধ্যে খুব নামওয়ালা রাজা ছিলেন ভোজদেব। ধার নগরে এখনও ভোজ রাজার অনেক কীর্ত্তি বিদ্যমান এবং এই ভোজরাজার সম্বন্ধে অনেক কাহিনী এখনও শুন্‌তে পাওয়া যায়। তারপরই এ-দেশে মুসলমানের আগমন। দিল্লীর বাদশা আল্‌তামাস্‌ ভিল্‌সা ও উজ্জয়িনী লুণ্ঠন করেন। বাদশা আলা-উদ্দীন এই প্রদেশ অধিকার করে একে একেবারে দিল্লী সাম্রাজ্যের একটা বড় রকম সুবা করে দেন; এবং দিলাওয়ার খাঁ এই প্রদেশের সুবাদার হয়ে ১৪০১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন এবং নিজেই স্বাধীন নরপতি হয়ে বসেন; এবং সেই থেকে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ প্রদেশ স্বাধীনতা ভোগ করে। পরে ১৫৩৪ অব্দে গুজরাটের বাহাদুর শাহ এই দেশ দখল করেন। মোগল সম্রাট হুমায়ুন এসে বাহাদুর শাকে তাড়িয়ে দেন। শেষে হুমায়ুনকেও স্থির থাক্‌তে দিলেন না শের শাহ। শের শাহ মালোয়া জয় করে একেবারে মাণ্ডুতে এসে পড়লেন এবং তাঁর একজন প্রধান সেনাপতি সুজায়াত খাঁকে মাণ্ডুর সুবাদারী পদে অভিষিক্ত করে দিল্লী চ'লে গেলেন। হুমায়ুন পরে যখন পুনরায় দিল্লীর বাদশাহী পেলেন, তখন আর মাণ্ডুর দিকে দৃষ্টি করবার তাঁর সময় হোলো না, রাজ্য পুনঃ-প্রাপ্তির কিছুদিন পরেই তাঁর দেহান্ত হয়। এদিকে সুজায়াত খাঁই মাণ্ডু রাজ্যের কর্ত্তা হয়ে বসেন, দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন। তাঁহারই পুত্রের নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাজিদ। তিনি বাজ বাহাদুর নামেই পরিচিত। এই বাজ বাহাদুরের সময়ই মাণ্ডুর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু, এ শ্রী বেশী দিন স্থায়ী হোলো না; দিল্লীশ্বর আকবর বাজ বাহাদুরকে পরাজিত করে মাণ্ডু রাজ্য মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত করে দিলেন। তার পর

মোগল রাজ্য যখন পতনের দিকে গেল, সেই সময় গিরিধর বাহাদুর নামে একজন নাগর ব্রাহ্মণ কিছুদিন মাণ্ডুতে রাজত্ব করেন। তাঁর হাত থেকে মারাঠারা এই রাজ্য কেড়ে নেন এবং এখন পর্য্যন্তও মাণ্ডু ধার-রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে রয়েছে। মোট কথা এই যে, বাজ বাহাদুরের পরলোক-গমনের পরই মাণ্ডু রাজ্যের ধ্বংস আরম্ভ হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই মাণ্ডুর সমস্ত গরিমা ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়; বড় বড় অট্টালিকা, রাজ-প্রাসাদ, মস্‌জিদ ভেঙ্গে পড়তে থাকে, আর মানুষের স্থান পশুরা দখল ক'রে বসেন। মাণ্ডু এমন জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং সেখানে হিংস্র জন্তুর এমন প্রাদুর্ভাব হয় যে, এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রবেশ করতে কেহ সাহসী হ'তেন না।

মাণ্ডুর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হ'তে থাকল; সেখানে যারা বাস করত, তারা হিংস্রজন্তুর ভয়ে পালিয়ে গেল; চারিদিক জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে গেল; এতকালের রাজধানীর বড় বড় প্রাসাদ সব ভেঙ্গে পড়তে লাগল। কারও দৃষ্টি সেদিকে পড়ল না; মাণ্ডু রাজধানী মহাশ্মশানে পরিণত হ'য়ে গেল।

শুভক্ষণে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের তদানীন্তন বড় লাট লর্ড নর্থব্রুকের দৃষ্টি মাণ্ডুর দিকে আকৃষ্ট হোলো; বাজ বাহাদুর ও রূপমতীর লীলাস্থল দেখবার বাসনা তাঁর জাগ্রত হোলো। তিনি মাণ্ডুতে গেলেন। বাইরে থেকে এই বিশাল ধ্বংসাবশেষ দেখে তিনি ব্যথিত হলেন। তাঁর আদেশে ধার দরবার অন্ততঃ কিঞ্চিৎ রক্ষা করতে অগ্রসর হলেন, দরবার থেকে ত্রিশ হাজার টাকা খরচও করা হোলো; কিন্তু জঙ্গল পরিষ্কার ও জীর্ণসংস্কার সামান্য মাত্রই অগ্রসর হোলো। তার পর আবার জঙ্গল বাড়তে লাগল, প্রাসাদ মস্‌জিদ ভেঙ্গে পড়তে লাগল। মাণ্ডুর সংস্কার ও

ভারত গবর্ণমেণ্ট তখন প্রথমে কুড়ি হাজার টাকা মাণ্ডুর জন্য মঞ্জুর করলেন; তার পরের বৎসর গবর্ণমেণ্ট আরও চল্লিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের হাতে এই জীর্ণোদ্ধারের ভার পড়েছিল। সেই সময় যে কয়েকটী প্রাসাদ ও মস্‌জিদের সংস্কার সাধিত হয়েছিল, তার বিশেষ বিবরণ Archaeological Survey of India ১৯০৩-৪ অব্দের বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিল, তার পর আমরা যখন মাণ্ডু দেখতে গিয়েছিলাম, তার কয়েক মাস পূর্ব্বে আগষ্ট মাসে (১৯২৮) বর্ত্তমান বড় লাট লর্ড আর্‌উইন বাহাদুর মাণ্ডু দেখতে গিয়েছিলেন। সেই সময় রাস্তা ঘাট ও প্রাসাদগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছিল। তাই আমাদেরও মাণ্ডু দেখবার অনেক সুবিধা হয়েছিল।

মাণ্ডুর আসল কথাই কিন্তু বলা হয় নি। সেটী হচ্চে রূপমতীর কথা! রূপমতীর সম্বন্ধে ঐ প্রদেশে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। সেই সমস্ত কাহিনী থেকে বেছে নিয়ে দুইটীর সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাই। কেহ কেহ বলেন, রূপমতী সারঙ্গপুরের এক ব্রাহ্মণের কন্যা। বাজ বাহাদুর রাজা হবার পূর্ব্বেই রূপমতীর রূপ দেখে মুগ্ধ হন; এবং যখন তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হন, তখন রূপমতীর পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি তাকে বিবাহ করেন।

এ কাহিনীটি নানা কারণে বিশ্বাসযোগ্য নয়। তার মধ্যে প্রধান কারণ হচ্চে এই যে, রূপমতীর ব্রাহ্মণ পিতা, কন্যা রাজরাণী হবে এই লোভে মুসলমানের হাতে কন্যা সমর্পণ করতে কিছুতেই রাজী হতে পারেন না। বড়মানুষ বা রাজারাজড়ার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু গরীব ব্রাহ্মণ কিছুতেই এমন কাজ করতে পারেন না। সুতরাং, দ্বিতীয় যে কাহিনীটি বল্‌ব, তা

অর্থাৎ উপন্যাসের ঘটনা, এই কাহিনীতে তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সে কাহিনী এই—

ধরমপুরী নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে থান সিং নামে একজন রাঠোর রাজপুত বাস করতেন। তিনি সম্পত্তিশালী না হ'লেও মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ছিলেন। তাঁর একটী পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যাটীর অলোক-সামান্য রূপ দেখে তার নাম রাখা হয়েছিল রূপমতী।

রূপমতীদের বাড়ীর কাছেই একটা অরণ্য ছিল। অনেকে সেই অরণ্যে শিকার করতে আস্‌ত। সেই অরণ্যের মধ্যে, রূপমতীদের বাড়ীর অনতিদূরেই, একটা ঝরণা ছিল। রূপমতী ও তার সঙ্গিনীরা অনেক সময় সেই ঝরণার তীরে বেড়াতে আস্‌ত।

একদিন তারা যখন ঐ ঝরণার কাছে ব'সে আছে, তখন এক রাজ-পুত্র তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সেই জঙ্গলে শিকার করতে এসে ঘটনাক্রমে সেই ঝরণার নিকট-উপস্থিত হয়েছিলেন। এই রাজপুত্র আর কেহই নন, মাণ্ডুর সুবাদার বাজ বাহাদুর। অরণ্যের মধ্যে এমন অতুলনীয়া সুন্দরী কিশোরীকে দেখে বাজ বাহাদুরের সঙ্গীরা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে উৎসুক হোলো। কিন্তু বাজ বাহাদুর তাদের নিষেধ করলেন। তিনি এই পরমাসুন্দরী কিশোরীর রূপ দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বাজ বাহাদুরও অতি রূপবান যুবক ছিলেন; রূপমতীও তাঁর দিকে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইলেন।

বাজ বাহাদুর তখন ধীরে ধীরে রূপমতীর কাছে গিয়ে প্রেম-নিবেদন করলেন এবং আত্মপরিচয়ও দিলেন। কুমারী যদি সম্মত হয়, তা হ'লে তাকে মাণ্ডুতে নিয়ে গিয়ে পরম সমাদরে রাখ্‌বেন, এ কথাও বাজ বাহাদুর বল্‌লেন। রূপমতী তখন বল্‌ল "যদি আপনি ঐ পবিত্র রেওয়া নদীর

হ'লে আমি আপনার বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হ'তে পারি।" এই অসম্ভব প্রস্তাব শুনে বাজ বাহাদুর ক্ষণকাল নীরব হ'য়ে রইলেন; তাঁর উত্তর দিবার কোন কথাই মনে হোলো না। আর এমন অসম্ভব আব্‌দার যে একটী পল্লীবাসিনী কিশোরী করবে, তা তিনি মনেও করেন নাই। তাকে জোর করে রাজ-প্রাসাদে নিয়ে যেতেও তাঁর মত সদাশয় রাজার অভিপ্রায় হোলো না। তিনি তখন সসম্ভ্রমে রূপমতীকে অভিবাদন ক'রে নিরাশ হৃদয়ে মাণ্ডুতে চ'লে গেলেন।

বিধর্ম্মী বাজ বাহাদুর রাঠোর কুমারীর মুখ দেখ্‌তে পেয়েছে; সুধু দেখাই নয়, রূপমতী তার সঙ্গে কথা বলেছে, তাকে কঠিন সর্ত্তে বিবাহ করবে বলে কথা দিয়েছে, এ সংবাদ গোপন থাক্‌ল না; তার সঙ্গিনীরা গ্রামে গিয়ে কথাটা প্রচার করে দিল। রূপমতীর পিতা এমন অপমানকর ব্যাপার শুনে রাগে অধীর হয়ে পড়্‌লেন। তখনই পঞ্চায়েত ডাকা হোলো। পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত হোলো যে, রূপমতীকে সেই দিনই বিষপানে আত্মহত্যা ক'রে এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

সেদিন আবার গ্রামে বসন্তোৎসব ছিল। রূপমতীকে বিষদানে হত্যা করা হবে, এই কথা শুনে গ্রামের পুরোহিত তাড়াতাড়ি সেখানে উপস্থিত হ'লেন এবং রূপমতীর পিতা ও অন্যান্য সকলকে অনুরোধ করলেন যে, এই বসন্তোৎসবের দিনে গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীকে এমন ভাবে শাস্তি দিয়ে কাজ নেই। সেদিনের মত বিষদান বন্ধ থাকুক; পরদিন রূপমতী বিষ-পানে প্রাণত্যাগ করবে। বৃদ্ধ পুরোহিতের আদেশ কেহই অমান্য করতে পারলেন না; সেদিনের মত বিষদানের ব্যাপার বন্ধ থাক্‌ল।

সেই রাত্রিতে রূপমতী স্বপ্ন দেখল, রেওয়া দেবী তার সম্মুখে আবির্ভূতা হ'য়ে তাকে বল্‌ছেন "তোর উপর আমার দয়া হয়েছে। তোর কথা রক্ষা করেছি।

আমার পবিত্র জল ধারাকারে বাহির হচ্চে। তুই বাজ বাহাদুরের কাছে যে কথা বলেছিস্ আমি তা পূর্ণ করেছি। এখন তুই বাজ বাহাদুরকে আত্মসমর্পণ কর। তোর প্রতিজ্ঞা তুই পালন কর।”

রেওয়া দেবী সুধু রূপমতীকেই স্বপ্নে এ আদেশ দেন নাই, বাজ বাহাদুরকেও সেই রাত্রে দর্শন দিয়ে ঐ কথা বলেন। বাজ বাহাদুর প্রাতঃকালে উঠেই দেবী-নির্দ্দিষ্ট সেই তেঁতুলতলায় গিয়ে দেখেন, পবিত্র জলধারা সেই তেঁতুল গাছের পাশ দিয়ে উৎসারিত হচ্চে। তিনি তখনই ঘোড়ায় চ'ড়ে রূপমতীর গ্রামে উপস্থিত হলেন। সকলেই এই আশ্চর্য্য কাহিনী শুন্‌ল। দেবীর আদেশ, আর সে আদেশের প্রত্যক্ষ নিদর্শনও রয়েছে। তখন কেহ আর কোন আপত্তি করতে পারল না; রূপমতী তার সত্য রক্ষার জন্য বাজ বাহাদুরের সঙ্গে মাণ্ডুতে চলে গেল।

তার পরেও কিছু আছে। এই প্রণয়ীযুগল মহাসুখে বাস করতে লাগলেন। উভয়েই কবি ছিলেন, উভয়েই গীতবাদ্যে অনুরক্ত ছিলেন। শুনতে পাওয়া যায়, বাজ বাহাদুর তাঁর প্রাসাদ থেকে কবিতা লিখে রূপমতীর প্রাসাদে পাঠিয়ে দিতেন, রূপমতী আবার তার উত্তরে কবিতা লিখে পাঠাতেন। সে সকল কবিতার অনেকগুলো এখনও শুন্‌তে পাওয়া যায়। যাঁরা বাজ বাহাদুর ও রূপমতীর এই সকল কবিতা পড়তে চান, তাঁরা Mr. L. M. Crump C. I. E. মহোদয়ের লিখিত পুস্তক পাঠ করলে সমস্ত বিবরন জান্‌তে পারবেন।

যেদিন আকবর বাদশাহের সেনাপতি আদম খাঁ বাজ বাহাদুরকে পরাজিত করলেন, সেই দিন বাজ বাহাদুর রূপমতীকে সংবাদ পাঠালেন যে, আর কোন উপায় নেই, রূপমতী যেন তাঁর প্রাসাদ থেকে কোথাও পলায়ন করেন। এই সংবাদ পেয়ে রূপমতী বাজ বাহাদুরকে ব'লে

বাহাদুর কালবিলম্ব না করে রূপমতীর প্রাসাদে গিয়ে দেখেন, রূপমতী হীরকচূর্ণ সেবন ক'রে প্রাণত্যাগ করেছেন। তাঁর দেহ শয্যার উপর পড়ে রয়েছ। রূপমতীর কথা এইখানেই শেষ!

এইবার আমাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলি। ধার থেকে মাণ্ডু কুড়ি মাইল পথ। এই কুড়ি মাইল পথ যেতে আমাদের দুই ঘণ্টা সময় লেগেছিল। আর এই দুই ঘণ্টাকাল সত্যচরণ বাবু মাণ্ডু ও ধারের ইতিহাস অবিশ্রান্ত বল্‌তে বল্‌তে গিয়েছিলেন। আমরা অনেকেই শুনেছিলাম, কিন্তু আমি ত বল্‌তে পারি, তাঁর বর্ণিত এই ইতিহাসের সামান্য দুই চারিটী কথা মাত্র মনে আছে।

মাণ্ডুতে যখন পৌছিলাম, তখন বেলা দশটা। গাড়ী থেকে নেমে সেই যে ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে প্রবেশ করলাম, তার আর অন্ত পেলাম না; শুধু প্রাসাদ আর মস্‌জিদের ছড়াছড়ি; আর সে সবের কতক বা একেবারে ভূমিসাৎ হয়েছে, কতকগুলো বা অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে আছে; গুটিকয়েক-মাত্র প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের চেষ্টায় মৃৎসমাধি থেকে মাথা তুলেছেন। ক্রোশের পর ক্রোশব্যাপী স্থান জুড়ে সুধু প্রাসাদ আর মস্‌জিদ,মন্দির আর জলাশয়; আর দূরবিস্তৃত নিবিড় জঙ্গল, তার ভিতরে সাপ বাঘ ও হিংস্রজন্তুর অবাধ রাজত্ব!

এখনও মাণ্ডুতে যা দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং যেগুলির মধ্যে প্রবেশ করবার সাহস হয়, তার মধ্যে গুটিকয়েকের নাম বল্‌ছি; যথা—হিন্দোলামহল, জাহাজমহল (জলাশয়ের মধ্যে নির্ম্মিত ব'লে এই নাম হয়েছে), হাবেলীমহল, ধাইমহল, চম্পা বাউড়ি, জামি মস্‌জিদ, মাদ্রাসা, মহম্মদ খিলিজির সমাধি, হোসেন শাহের সমাধি, বাজ বাহাদুর ও রূপ-মতীর প্রাসাদ, আস্‌রফি মহল। এইগুলিই প্রধান এবং গবর্ণমেণ্টের

পথ আছে। এ ছাড়া ছোটখাটো আরও অনেক প্রাসাদ আছে। তাদের কয়েকটীর নাম বল্‌ছি, যথা—সাতকুঠুরী, চোরকুঠুরী, এক খাম্বা, রেবা কুণ্ড, সাগর-তালাও, নীলকণ্ঠেশ্বর শিবের মন্দির, ইত্যাদি। চম্পা বাউড়ি মাটীর নীচের একটী প্রাসাদ; উপর থেকে ছোট ছোট সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে। প্রথমে ত আমরা নামতে সাহস পেলাম না, যদি কোন হিংস্র জন্তু সেখানে থাকে। সত্যচরণবাবু অভয় দিলেন, নীচের মহলে সে সব কিছু নেই; লাট সাহেবের ভয়ে তাঁরা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছেন। তাই সাহস ক'রে নীচে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড চক-মিলানো প্রাসাদ; দারুণ গ্রীষ্মের সময় বাদশারা এখানে আশ্রয় নিতেন। এই চক-মিলানো প্রাসাদের চত্বরে আবার একটা সরোবর আছে। সেকালে বোধ হয় জল যাতায়াতের পথ ছিল; এখন আর তার সন্ধান পেলাম না; জল একেবারে কৃষ্ণবর্ণ।

আর একটা ছোট প্রাসাদ দেখলাম, তার নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি—ধাই মহল। এই অট্টালিকাটি রাস্তা থেকে নীচে এবং একটু দূরে। এই ধাই মহলের একটা বিশেষত্ব আছে। রাস্তার উপর এক স্থানে একটা কাষ্ঠ-ফলক রয়েছে। তাতে লেখা আছে Echo point। এই স্থান থেকে ধাই-মহল পর্য্যন্ত সরলরেখা-পথের যেখানে ইচ্ছা সেখানে দাঁড়িয়ে কোন কথা বল্‌লে তখনই দ্বিগুণ উচ্চ স্বরে তার প্রতিধ্বনি হয়। এই সরলরেখা-পথ ছেড়ে বাঁয়ে কি ডাইনে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌লেও তার আর প্রতিধ্বনি হয় না। আমরা এই প্রতিধ্বনি-রেখায় দাঁড়িয়ে যে কথা বল্‌লাম, তারই প্রতিধ্বনি শুন্‌তে পেলাম।

উপরে যতগুলি স্থানের নাম বল্‌লাম, সেগুলি দেখ্‌তে দেখ্‌তেই বেলা প্রায় একটা বেজে গেল; এখনও কিন্তু রূপমতীর প্রাসাদ দেখা হয় নাই।

অবস্থিত। আমরা তখন 'বাসে' উঠে রূপমতীর প্রাসাদ দেখতে গেলাম। জুম্মা মসজিদের নিকট থেকে আমরা 'বাসে' উঠলাম। দুই মাইল পথ অতিবাহিত করে এক স্থানে 'বাস' দাঁড়িয়ে গেল। সেখান থেকে চড়াই আরম্ভ। সে চড়াইতে বাস উঠতে পারবে না ; ভাল মোটর যেতে পারে। তাই ত, এখন এই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এতটা পথ উঠি কি করে। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় আমাদেরই বন্ধু, কাশীর সর্ব্বজনপরিচিত শ্রীযুক্ত রায় ললিতমোহন সেন বাহাদুর তাঁর একটী মেয়ে নিয়ে একখানি মোটরে চড়ে সেই চড়াইয়ের মুখে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর মোটরে একটু স্থান ছিল। তিনি আমাকে দেখে তাঁর মোটরে তুলে নিলেন। রূপমতীর প্রাসাদের দুয়ারের কাছে আমরা নামলাম।

প্রাসাদটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত। একতলা বাড়ী। সিঁড়ি দিয়ে উপরে গিয়ে দেখা গেল, চারি কোণে চারটী গম্বুজ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম, এই গম্বুজে ব'সে রূপমতী সেতার বাজিয়ে গান করতেন এবং দুই মাইল দূরে প্রাসাদের উপর ব'সে বাজ বাহাদুর সেই গানের উত্তর দিতেন। কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন—দূরত্ব যে দুই মাইল! তখন রেডিয়ো ছিল কি ?

রূপমতীর প্রাসাদ থেকে যখন নামলাম, তখন বেলা প্রায় আড়াইটে। এতক্ষণের মধ্যে মুখে একটু জলও দিতে পারি নাই ; ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, আর পথশ্রমে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তখন সত্যবাবু বললেন, জুম্মা মসজিদের কাছে যে কালীবাড়ী আছে, সেখানে গিয়ে বিশ্রাম ও জলযোগ করা যাবে। জলযোগ যে কি হবে, তা ভেবে পেলাম না। তা না হোক, হাত-পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম করতে পারলেই বাঁচি।

আধঘণ্টা পরেই আমরা কালীবাড়ীতে এলাম। সেখানে দ্বিতলে

পড়া গেল। একটু পরেই দেখা গেল, আমাদের সঙ্গী দুইজন 'বাস' থেকে একটা ঝুড়ি আর একটা হাঁড়ি নিয়ে এলেন। ঝুড়িতে কতকগুলি লুচি আর হাঁড়িতে তরকারী ছিল। সকলে মিলে তাই প্রসাদ পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, আমাদের যে রকম ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল, তাতে ঐ রসদ পাঁচজনেরই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে না; তাতেই চোদ্দজন মানুষ কিঞ্চিৎ জলযোগ করে এবং একটু বিশ্রাম করে প্রায় চারটার সময় বেরিয়ে পড়া গেল। সত্যবাবু তখনও বলেন "আরে, আরও যে অনেক দেখ্‌তে বাকী রইলো।" রইলো ত রইলো মশাই! যেতে হবে যাট মাইল পথ।

একটী কথা বলা হয় নাই; আমাদের অগ্রগত দলের দুই-একখানি বাসের সঙ্গে অনেক আগে একবার মাত্র দেখা হয়েছিল; তার পরেই তাঁরা ইন্দোরে চ'লে গিয়েছিলেন এবং অপরাহ্ণ দুইটার সময়ই ইন্দোরে পৌঁছে-ছিলেন। অনেকে সেই সন্ধ্যার গাড়ীতেই ইন্দোর ত্যাগ করেছিলেন; আমাদের কেদার দাদাও সেই সঙ্গে ছিলেন।

মাণ্ডুকে দণ্ডবৎ করে আমরা যখন যাত্রা করলাম তখন প্রায় চারটে। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বেই ধারে পৌঁছিলাম। সত্যবাবু তখন ধ'রে বস্‌লেন যে, ধারের দুর্গটা দেখ্‌তেই হবে। কি করা যায়! দুর্গে যাওয়া গেল। বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই নেই; অল্প কয়েকটা কামান বন্দুক আছে, আর কয়েকজন শান্ত্রী আছে। সেখান থেকে নেমে ডাক-বাংলায় এসে এক-একজন দুই তিন পেয়ালা চা পান করে একটু যেন সজীব হওয়া গেল।

ধার থেকে যখন যাত্রা করা গেল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। সারথি বল্‌লেন, এই সাড়ে আটটার মধ্যে অর্থাৎ দেড় ঘণ্টায় তিনি এই চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করবেন। ভাল কথা। মাইল পনর এসেই 'বাস' অচল! নিকটে আশ্রয়-স্থান নেই, দুপাশে ধু, ধু মাঠ। অনেক কষ্টে,

রাত্রি। ইন্দোরের স্কুলে যখন পৌছিলাম, তখন রাত্রি এগারটা। দেখি শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ আমাদের অপেক্ষায় ব'সে আছেন। সেই রাত্রিতে শৈলেন্দ্রের বাড়ীতে আমার আর নরেন্দ্রের অবস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে; সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির ব্যবস্থা সেইদিন প্রাতঃকালেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তখন সেই রাত্রি এগারটার পর জিনিসপত্র নিয়ে টঙ্গায় আরোহণ করে রেসিডেন্সির সীমানার মধ্যে শ্রীমান শৈলেন্দ্রের বাসায় যাওয়া গেল। তারপর প্রচুর আহারের পর নিদ্রা—বল্‌তে গেলে দুই রাত্রির পর এই নিদ্রা!

কথা ছিল, পরদিন প্রাতঃকালে আহারাদি শেষ করে আমরা ওঁকারনাথ দেখতে যাব এবং সেখান থেকে অজন্তায় যাব। আমরা দুইজন ছাড়া আরও দুইজন আমাদের সঙ্গী হবেন বলেছিলেন; তাঁরা আমাদের সঙ্গে বোম্বাই পর্যান্ত যাবেন! তাঁরা মাণ্ডুতেও আমাদের সঙ্গী ছিলেন। ইন্দোরে এসে তাঁরা অন্য স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা গোরক্ষপুর থেকে এসেছিলেন।

বলেছি, পরদিন ৩১শে ডিসেম্বর সোমবার ইংরাজী বৎসরের শেষ দিন আমরা ইন্দোর ত্যাগ করব! কিন্তু, ইন্দোরের বন্ধুদের ষড়যন্ত্রে তা হোলো না। সকলেই বল্‌লেন, একটা দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম না করলে দাদা নাকি নিশ্চয়ই মারা যাবেন; সুতরাং তাঁরা আমাদের কিছুতেই সেদিন ছাড়লেন না—আমাদের সারাটা দিন-রাত ইন্দোরে থাক্‌তে হলো; ওঁকারনাথ দেখ্‌বার বাসনা ত্যাগ করতে হলো।

ইন্দোরেই ইংরাজী ১৯২৮ অব্দের শেষ দিন বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গে মহানন্দে কাটানো গেল। পরের দিন ১লা জানুয়ারী ১৯২৯ ইন্দোর ত্যাগ।

এর পর থেকে যা লেখা হয়েছে, তা আমি লিখিনি; আমার ভ্রমণ-সঙ্গী, অবলম্বন-যষ্টি, সোদরোপম, সুকবি শ্রীমান নরেন্দ্র দেব লিখেছেন। তাঁকেই আমি লিখ্‌তে অনুরোধ করেছিলাম; তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করেছেন।

অজন্তার পথে

অজন্তা-গুহা সম্বন্ধে গ্রিফিথ্‌স্‌ সাহেবের প্রসিদ্ধ বইখানিই (The Paintings in the Budhist Caves at Ajanta) সর্ব্বপ্রথম আমার মনে 'অজন্তা' দেখে আস্‌বার একটা অদম্য আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু, ইচ্ছামাত্রেই তো আর সব কাজ হ'য়ে ওঠে না। ইংরাজীতে একটা কথা আছে বটে,—'যেখানে ইচ্ছা আছে—সেখানে উপায়ও আছে!' কিন্তু আমার বেলা এ কথাটা অনেকদিন কাজে খাটেনি; কারণ, ইচ্ছা আমার প্রবল থাকা সত্ত্বেও সঙ্গী, সময় ও অর্থ এই ত্রিবিধ অভাবের প্রতিবন্ধকতা বহুকাল আমার অজন্তা যাওয়ার পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়েছিল।

গত বৎসর বড়দিনের ছুটীতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্যে-সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে জলধর দাদার সঙ্গে সেই সুদূর ইন্দোরে যাবার প্রতিশ্রুতি যে আমি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা ক'রতে পেরেছিলুম, তার প্রধান কারণই হ'চ্ছে এই 'অজন্তা' ও 'ইলোরা' গুহা দেখে আসবার সুযোগ পাবো ব'লে! অবশ্য, রেবার রূপতরঙ্গ দেখবার এবং উজ্জয়িনীর শিপ্রা-তটে ঘুরে আসবার লোভটাও যে বড় কম ছিল তা নয়। কত ইতিহাস ও কাব্যবিশ্রুত মালব রাজ্য—সেখানকার চাঁদের আলোর সৌন্দর্য্য জগতে অতুলনীয় ব'লেই শোনা ছিল—সেখানে যাবার আকর্ষণ যে আমাদের একেবারেই ছিল না—এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। ইন্দোর অভিমুখে যে আমরা রওনা হ'য়েছিলুম অনেকগুলি উদ্দেশ্য নিয়েই, শুধু নিছক্‌ সাহিত্য সেবার জন্য নয়—এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কলিকাতা থেকে বেরিয়ে জব্বলপুর হ'য়ে ইন্দোর পর্য্যন্ত পৌঁছানো

আসার যা কিছু কাহিনী, সে সমস্তই শ্রদ্ধেয় জলধরদাদা আপনাদের শুনিয়েছেন। এইবার, ইন্দোর থেকে বোম্বাই পর্য্যন্ত যাওয়ার গল্পটুকু আপনাদের শোনাবার ভার দাদা আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

আমি কখন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিনি সুতরাং পথের খবর যে দাদার মতো সরস ক'রে আপনাদের শোনাতে পারবো, সে স্পর্দ্ধা আমার নেই। তবু যে লিখতে বসেছি, সে শুধু দাদার হুকুম তামিল করবার জন্যে।

পয়লা জানুয়ারী বেলা বারোটার সময় আমরা ইন্দোর ছেড়ে অজন্তা অভিমুখে রওনা হলুম। ইন্দোর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ধর, যাঁর গৃহে আমরা সম্মেলনান্তে দিন দুই আশ্রয় নিয়েছিলুম, তিনি, বারোটার মধ্যেই আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য বহুবিধ আয়োজন ক'রেছিলেন; এবং রাত্রে পথের প্রয়োজনের জন্য তাঁর স্নেহময়ী জননী প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত ক'রে আমাদের সঙ্গে দিয়েছিলেন। যে দু'দিন আমরা শৈলেনবাবুর অতিথি হ'য়েছিলুম, সে দু'দিন তাঁর মাতাঠাকুরাণী আমাদের এমন আদর-যত্ন করেছিলেন যে, আমরা যে বাড়ী ছেড়ে বিদেশে এসে আছি, এ কথা একবারও মনে হয়নি।

আমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে যাবার জন্য ইন্দোরের বাঙালী বন্ধুরা অনেকেই ষ্টেশন পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন। শৈলেন বাবু তো সঙ্গে ছিলেনই; তা ছাড়া পি, ডব্লিউ, ডির নীলমণি বাবু, সম্মেলনের সম্পাদক প্রমথবাবু, ওখানকার পণ্ডিতমশাই এবং ডাক্তার রুদ্রেন্দ্র পাল প্রভৃতি একাধিক ভদ্রলোক এসে আমাদের জিনিসপত্র সব গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমাদের সাদর বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন।

বি, বি, সি, আই রেলের খাণ্ডোয়া-আজমীর লাইনে সব মিটার গেজের ছোট গাড়ী। কাজেই তার কামরাগুলিও খুব ছোট। আমরা একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী একেবারে খালি পেয়েছিলুম। দু'জনে

গল্প ক'রতে ক'রতে যাচ্ছিলুম, ইন্দোর, উজ্জয়িনী ও মাণ্ডুর কথা। মাণ্ডুর হেড-মাষ্টার মশাইয়ের গল্প, উজ্জয়িনীর হরিদাসবাবুর দেবতুল্য আদর্শ চরিত্র, ইন্দোরের প্রবাসী বাঙালী বন্ধুদের আতিথেয়তার আলোচনা। এঁদের কথা যেন আমরা ব'লে আর শেষ ক'তে পারছিলুম না! দেখতে দেখতে গাড়ী ম্হাও ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো। ম্হাও ইন্দোর থেকে মাত্র চৌদ্দ মাইল দূরে। এটি একটি মিলিটারী ষ্টেশন। সুতরাং ইংরাজ গভর্মেণ্টের খাশ অধিকারভুক্ত হ'য়ে আছে। ম্হাও হোল্‌কার রাজ্যের অন্তর্গত হলেও এ স্থানে আর তাঁর কিছুমাত্র স্বত্ব নেই। গাড়ী ম্হাও ষ্টেশনে প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রবে জেনে প্লাটফর্মে নেমে খানিকটা পায়চারী ক'রে নেওয়া গেল। ষ্টেশন প্লাটফর্মে ও গাড়ীতে মারহাট্টি যাত্রীই অধিকাংশ চোখে পড়তে লাগলো। বম্বেওয়ালা মুসলমান, গুজরাটি ও পার্শীও দেখলুম বটে,—কিন্তু খুব কম। তাঁদের সংখ্যা শতকরা দু'তিনজনের বেশী হবেনা। ষ্টেশনে চা, খাবার, ফলমূল ও পান সিগারেট বিক্রয় হ'চ্ছে। রেলযাত্রীদের কিছুমাত্র অসুবিধা নেই।

গাড়ীর ঘণ্টা পড়তেই প্ল্যাটফর্ম থেকে কামরায় গিয়ে দেখি আরও দুজন সহযাত্রী পাওয়া গেছে! এঁরা আমাদের সঙ্গে খাণ্ডোয়া পর্য্যন্ত যাবেন। তারপর আমাদের পথ বিপরীত।

ম্হাও থেকে আমরা খানকয়েক খবরের কাগজ কিনে নিয়েছিলুম। কলকাতার কংগ্রেস আর একজিবিশনের খবর পড়তে পড়তে আমরা এগিয়ে চলেছিলুম খাণ্ডোয়ার দিকে। কলকাতা তখন আমাদের কাছ থেকে এক হাজার তিরাশী মাইল দূরে।

গাড়ীর নূতন সহযাত্রী দুটির মধ্যে একজন তরুণ মুসলমান যুবক ও অন্যজন বোম্বাইয়ের এক বৃদ্ধ হিন্দু উকীল। দু'জনেই গৌরকান্তি, সুশ্রী ও সুপুরুষ। তরুণ মুসলমান যুবকটির আপাদ-মস্তক য়ুরোপীয়

পরিচ্ছদে ঢাকা; কিন্তু বৃদ্ধ হিন্দু উকীলটির গায়ে লম্বা পার্শী কোট ও পরনে গরম কাপড়ের ঢিলে জামা ছিল। তিনিও আমাদের মতো এক-মনে খবরের কাগজ প'ড়ছিলেন। মুসলমান যুবকটির সঙ্গেও খবরের কাগজ, ইংরাজি ম্যাগাজিন ও রেলওয়ে টাইম-টেবল্ ছিল; কিন্তু, তিনি চুপ করে ব'সে একটির পর একটি সিগারেট অবিরাম টেনে যাচ্ছিলেন। যেন এ পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর কোনও সম্বন্ধ নেই এমনিই একটা ভাব।

অল্পক্ষণ পরেই দেখি, বোম্বাইয়ের বৃদ্ধ উকীলটির সঙ্গে মুসলমান যুবকটি হঠাৎ আলাপ-পরিচয় করে নিয়ে খুব গল্প জুড়ে দিয়েছেন। কথাবার্ত্তা তাঁদের ইংরাজীতেই হচ্ছিল। মুসলমান যুবকটি য়ুরোপ ঘুরে এসেছেন এবং বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধে তিনি ইংরাজপক্ষের সৈনিক হ'য়ে ফ্রান্সের সমরক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, এই সব কথাই তিনি বৃদ্ধকে বলছিলেন।

খানিক তাদের গল্প শুনতে শুনতে, খানিক বা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে এবং মাঝে মাঝে ইন্দোর রেলপথের দুধারে চমৎকার দৃশ্য দেখতে দেখতে শীতের অল্পায়ু দিন কখন যে বিদায়োন্মুখ হয়ে উঠেছিল টের পাইনি।

বেশ একটু ক্ষুধাবোধ হচ্ছিল। ঘড়ী খুলে দেখি তখনও পাঁচটা বাজেনি। সঙ্গে খাবার ছিল, কিন্তু সে রাত্রের জন্য রিজার্ভ; কাজেই পরের ষ্টেশনে কিছু জলযোগের উপযোগী আহার্য্য সংগ্রহ ক'রে নিতে হবে স্থির করলুম। বাদ্ওয়াহা ষ্টেশনে বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ চা খাওয়া হ'য়েছিল বটে, কিন্তু খাবার কিছু নেওয়া হয়নি। ট্রেণের 'কোষ্ঠীপত্র' খুলে দেখা গেল আগামী ষ্টেশন হ'চ্ছে 'মোড়টাক্কা'। মনে পড়ে গেল যে, এই 'মোড়টাক্কা' ষ্টেশন থেকে আমাদের তিনটি বন্ধুর এই ট্রেণ ধরবার কথা আছে। তাঁদের মধ্যে গোরক্ষপুরের শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ ও দিবাকর মুখোপাধ্যায় এম-এ আমাদের সঙ্গে বোম্বাই পর্য্যন্ত যাবেন এবং

নাগপুরের ডাক্তার সতীশচন্দ্র দাশ এম-বি ভুসাওয়াল থেকে নাগপুরে ফিরে যাবেন। খাণ্ডোয়া থেকে ভুসাওয়াল প্রায় ৭৪ মাইল। সতীশ-বাবুর অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল আমাদের সঙ্গে বোম্বাই পর্য্যন্ত যাবার; কিন্তু, নাগপুরের মেডিক্যাল ইস্কুলের হাসপাতালে যে তারিখ থেকে তাঁর 'ডিউটি' পড়বে, সেই তারিখের মধ্যে তিনি ফিরতে পারবেন না ব'লে যেতে সাহস করলেন না।

বেলা চারটে পঞ্চাশ মিনিটের সময় আমাদের ট্রেণ মোড়টাক্কায় এসে দাঁড়ালো। দিবাকরবাবু, বঙ্কিমবাবু ও সতীশবাবু ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে তাঁরা উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠলেন। আমরাও তাঁদের দেখতে পেয়ে আনন্দধ্বনি করে উঠলুম। ট্রেণ থেকে নেমে প'ড়ে তাঁদের গাড়ীতে তুলে নিলুম! তাঁরা মহা উৎসাহে তাঁদের পূর্ব্বদিনের এ্যাড্ভেঞ্চারের বিষয় গল্প ক'রতে লাগলেন। তাঁদের কথা শুনতে শুনতে গাড়ী ছাড়বার সময় হ'য়ে গেল। আমরা আমাদের কামরায় ফিরে এলুম। তাঁরা ঠিক আমাদের পাশেই আর একখানি কামরায় উঠেছিলেন। আমাদের আসবার একদিন আগে তাঁরা ইন্দোর থেকে বেরিয়ে মণ্ডলেশ্বর ও ওঙ্কারেশ্বর বেড়াতে এসেছিলেন। নর্ম্মদা-বক্ষে পর্ব্বতের উপর 'ছিন্নমস্তার' বিরাট মূর্ত্তি ও মণ্ডলেশ্বরে বিগ্রহ এবং রাণী অহল্যাবাঈয়ের রেবাঘাট ও আশ্রম ওখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান বলে পরিগণিত। আমাদেরও ইচ্ছা ছিল এ যায়গাগুলি দেখে যাবো, কিন্তু মাণ্ডু-প্রত্যাগত দাদাকে পথশ্রান্ত দেখে অধ্যাপক শৈলেনবাবু ও ডাক্তার রুদ্রেন্দ্র পাল কিছুতেই তাঁকে ইন্দোর থেকে বেরুতে দেননি; দু'দিন বিশ্রাম নেবার জন্য জোর করে ধ'রে রেখেছিলেন। অতএব আমাকেও তাঁর সঙ্গে থাকতে হ'য়েছিল।

এতক্ষণ হৈ-চৈয়ের মধ্যে কিছু মনে ছিল না, কিন্তু গাড়ী 'মোড়টাক্কা'

ছাড়তেই জলখাবারের কথা স্মরণ হ'লো। খাবার কিনতে ভুল হ'য়ে গেল ব'লে আক্ষেপ ক'রছি শুনে জলধরদা' বললেন "খাবার ত সঙ্গেই রয়েছে, বার করোনা, খাওয়া যাক। আমারও ক্ষুধা বোধ হ'চ্ছে।" আমি একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে ব'ললুম—"ও যে তাঁরা রাত্রে খাবার জন্ত দিয়েছেন!" দাদা বললেন—"রাত্রের আর দেরী কি ? তুমি খাবারটা পাড়ো, রাত্রিভোজ এই বেলা সেরে নেওয়া যাক।"

আর দ্বিরুক্তি না ক'রে খাবার নিয়ে বসা গেল। সঙ্গে যে এত প্রচুর খাদ্য ছিল তা জানতুম না। লুচি, তরকারী, ভাজা, মাছ ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি। এ মাছ সমুদ্রের। বোম্বে থেকে ইন্দোরে চালান আসে। খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু, দামও অত্যন্ত বেশী। শৈলেনবাবুর মাতাঠাকুরাণী আমাদের দু'জনের জন্ত এত অপর্য্যাপ্ত আহার্য্য সামগ্রী দিয়েছিলেন যে, আমরা ভরপেট খেয়েও ফুরুতে পারছিলুম না।

খাওয়ার পর ট্রেণের জানালা থেকে হাত বাড়িয়ে আমি যখন হাত ধুয়ে ফেলছি, সেই সময় আমার আঙ্গুল থেকে একটী আংটি কেমন করে খুলে গিয়ে রেল-লাইনের ধারে ছিট্‌কে পড়ে গেল! ট্রেণ তখন ঘণ্টায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ মাইল ছুটেচে!

তাড়াতাড়ি জলধরদাদাকে ও সহযাত্রিদের ব্যাপারটা জানিয়ে ট্রেণ থামাবার জন্ত ব্যস্ত হ'য়ে আমি গাড়ীর 'এলার্‌ম্ চেন্' ধরে টানতে যাচ্ছিলুম, বোম্বাইয়ের বৃদ্ধ উকীলটি আমাকে বাধা দিয়ে ব'ললেন—"এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আপনার আংটির দাম কতো? পঞ্চাশ টাকার বেশী কি ?"

আমি বললুম—"বাজারে আংটির দাম পঞ্চাশের ঢের কম, কিন্তু আমার কাছে ওর দাম অনেক।"

বৃদ্ধ উকীলটি মৃদু হেসে বললেন, "আংটিটি পড়ে যাওয়ায় সেন্টিমেণ্টের

বা ভাবের দিক থেকে আপনি হয় ত খুব ক্ষতি বোধ ক'রছেন স্বীকার করি, কিন্তু মেটিরিয়্যাল বা আর্থিক ক্ষতি আপনার পঞ্চাশ টাকা জরিমানার চেয়ে যখন অনেক কম বলছেন, তখন গাড়ী থামিয়ে অনর্থক কেন অর্থদণ্ড দেবেন? এই সন্ধ্যার অন্ধকারে চলন্ত ট্রেণ থেকে আপনার আংটি ছিট্‌কে পড়ে কোথায় জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে তার ঠিক কি? ট্রেণ ছুটছে, সুতরাং ঠিক কোন্ জায়গায় আংটিটি পড়েছে আন্দাজ করতেও পারা যাবে না! অতএব বুঝতেই পাচ্ছেন, ছোট একটি আংটিকে এই অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর থেকে এখন খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কত কম! এদিকে এ ট্রেণখানি থামিয়ে রাখার ফলে গাড়ী যথাসময়ে খাণ্ডোয়ায় গিয়ে পৌঁছুতে পারবে না। খাণ্ডোয়া একটি মস্ত জংসন। বহু যাত্রী, যারা খাণ্ডোয়ায় গাড়ী বদল ক'রে অন্য গাড়ী ধ'রে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন, এ ট্রেণ বিলম্বে গিয়ে সেখানে পৌঁছুলে তাঁরা সব আর গাড়ী পাবেন না। এই শীতের রাত্রে পথের মধ্যে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। সেটা কি হতে দেওয়া আপনার উচিত? বিবেচনা করে দেখুন।"

বৃদ্ধ উকীলটির কথাগুলি আমার কাছে খুব সমীচীন বলে মনে হওয়াতে আমি শিকল টেনে গাড়ী থামানো থেকে নিরস্ত হলুম। কিন্তু আংটিটার জন্য আমার অত্যন্ত মন খারাপ হ'য়ে রইল। আমি চুপটি করে বিষণ্ণমুখে গাড়ীর এককোণে নিরুপায়ের মতো বসে রইলুম।

আমার অবস্থা দেখে তরুণ মুসলমান যুবকটি সহানুভূতি-পূর্ণ কণ্ঠে বল্‌লেন—"আপনার এই আকস্মিক ক্ষতিতে আমি অত্যন্ত দুঃখ বোধ করছি বন্ধু! আংটিটির কথা আপনি আর ভাববেন না। তবে, খাণ্ডোয়ায় পৌঁছে রেলওয়ে পুলিশকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখবেন। কিছু পুরস্কারের আশা দিলে তারা হয় ত খুঁজে দেখতে পারে এবং আপনার

ভাগ্য যদি খুব সুপ্রসন্ন হয়, তা হ'লে হয় ত আংটিটী পাওয়া গেলেও যেতে পারে!"

সারাটা পথ মুসলমান যুবকটির মুখ থেকে সুরার উগ্র সৌরভ পাওয়া যাচ্ছিল ব'লে আমি তার এ পরামর্শটাকে মোটেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ক'রতে পারলুম না। মাতালের প্রলাপ-উক্তি হিসাবে অগ্রাহ্য করলুম। কিন্তু, বৃদ্ধ উকীলটি মহা উৎসাহিত হ'য়ে বললেন "ও ঠিক বলেছে। আপনি অতি অবশ্য অবশ্য খাণ্ডোয়ায় পৌঁছে পুলিশকে আপনার এই ক্ষতির কথা জানিয়ে রাখবেন। যদি ওই আংটি উদ্ধার হওয়া সম্ভব হয়, তবে ওদের দ্বারাই হ'তে পারে।"

জলধরদাও তাঁদের এ পরামর্শে সম্পূর্ণ অনুমোদন করলেন দেখে আমি টাইম্-টেবেল্ খুলে আমার পকেট-বইয়ে নোট করে রাখলুম যে 'সীর্‌রাণ' থেকে 'অজান্তী' ষ্টেশনের মধ্যে ছটা নাগাদ "31 Up" প্যাসেঞ্জারের দক্ষিণ দিকের জানালা গলে বি, বি, সি, আই, রেল লাইনের ধারে আমার আংটিটি পড়ে গেছে।

আংটি-হারানোর ব্যাপারে সহযাত্রীদের সঙ্গে আমাদের আলাপ খুব জমে উঠলো। আমরা অজন্তা ও ইলোরা দেখতে যাবো শুনে মুসলমান যুবকটি উপযাচক হ'য়ে আমাদের পথের সন্ধান সমস্ত বলে দিলেন এবং জালগাঁও ষ্টেশনের ধারেই ওখানকার লাইব্রেরীতে তাঁর এক বন্ধু থাকেন। তাঁর মোটর ও পেট্রলের কারবার আছে। তিনি আমাদের সস্তায় মোটর ঠিক করে দেবেন ব'লে মুসলমান যুবকটি তাঁর নামে একখানি চিঠি লিখে দিলেন আমাদের কাছে।

সন্ধ্যে সাড়ে ছটা নাগাদ গাড়ী খাণ্ডোয়া ষ্টেসনে এসে পৌঁছিল। খাণ্ডোয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কুমারেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ইন্দোরে এঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'য়েছিল। ইনি

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে খাণ্ডোয়ার প্রতিনিধি স্বরূপ যোগদান ক'রেছিলেন। লোকটি অতি ভদ্র ও সুজন।

গাড়ী থেকে মোটঘাট সব নামিয়ে বোম্বাই যাবার গাড়ীতে তুলে দেবার জন্য কুলি ঠিক করে, জলধরদাদা, দিবাকর, বঙ্কিম ও সতীশ ডাক্তারকে মালপত্রের তত্ত্বাবধানে রেখে, আমি কুমারেন্দ্রবাবুকে ধ'রে নিয়ে রেলওয়ে পুলিশের আফিসে হাজির হলুম। সেখানে গিয়ে দেখি 'ইন্স্‌পেক্টর' হাজির নেই। একজন নির্ব্বোধ কন্‌ষ্টেবল্ দাঁড়িয়ে ছিল। সে কিছু বুঝতে পারলে না এবং ইন্স্‌পেক্টার সাহেব কখন আসবেন তাও সে জানে না বললে।

অগত্যা, অত্যন্ত হতাশ হ'য়ে আংটি সম্বন্ধে যা কিছু করা দরকার তার সমস্ত ভার কুমারেন্দ্রবাবুর স্কন্ধে তুলে দিয়ে যখন ফিরতে উদ্যত হয়েছি, সেই সময় ইন্স্‌পেক্টার সাহেব এসে উপস্থিত হলেন! তাঁকে সমস্ত ঘটনা বললুম। তিনি অত্যন্ত ভদ্রলোক। পাঞ্জাবী বলে মনে হ'লো। তিনি হেসে বললেন—"আপনার আংটি যখন রেলে চুরী হয়নি, আপনাদেরই অসাবধানতা বশতঃ জানালা দিয়ে প'ড়ে গেছে, তখন পুলিশ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তবে, আপনি যখন দশটাকা পুরস্কার দেবেন বলছেন, তখন আমি পি, ডব্লিউ, ডির লোকদের বলে দেবো। তারা কাল ভোরে ওইখানে লাইনের কাজ ক'রতে যাবে—খুঁজে দেখবে—যদি আংটি পায়।"

আমি বললুম—"যদি পায় তবে তাদের বলবেন এই কুমারেন্দ্রবাবুকে এনে দিতে। ইনি খুব অনুগ্রহ ক'রে এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন। এঁর কাছে যে কেউ আংটিটি নিয়ে আসবে, তাকেই ইনি আমার প্রতিশ্রুত দশটাকা পুরস্কার দেবেন।"

পুলিস ইন্স্‌পেক্টার এই মর্ম্মে আমার কাছ থেকে একখানি চিঠি চেয়ে

নিলেন। তাঁকে চিঠি দিয়ে ফিরে এসে খবর পেলুম আমাদের গাড়ী আসতে এখনও দেড় ঘণ্টা দেরী, অর্থাৎ সাড়ে আটটার আগে আর গাড়ী পাওয়া যাবে না। ইতিমধ্যে কুমারেন্দ্র বাবুর স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা ও খাণ্ডোয়ার জনৈক প্রসিদ্ধ উকীল ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং অন্যান্য কয়েক-জন খাণ্ডোয়া-প্রবাসী বাঙ্গালী ফুলের মালা-টালা নিয়ে ষ্টেশনে সমবেত হ'য়ে শ্রীযুক্ত জলধরদাদা ও সেইসঙ্গে ল্যাঙ্‌বোট্‌ আমাদেরও একটি ছোট-খাটো অভ্যর্থনার আয়োজন করে তুলেছিলেন। কুমারেন্দ্রবাবুর সুযোগ্যা সুহাসিনী বিদুষী পত্নীর ও খাণ্ডোয়ার সেই উকীলবাবুর কন্যা সুশীলা ইলা দেবীর আদর অভ্যর্থনায় আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করেছিলুম। ইন্দোরের প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন-সভা কুমারী ইলা দেবীর কোকিল-কণ্ঠের কলগীতে কয়দিনই মুখরিত হ'য়েছিল।

সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ও গল্প ক'রতে ক'রতে কখন যে সময় কেটে গেল টের পাইনি। হুস্‌ হুস্‌ ক'রে ট্রেণ এসে পড়তে আমাদের হুঁস হ'লো। তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হ'য়ে মোটঘাট নিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়লুম। গাড়ীতে খুব ভীড় ছিল। আমরা হয় ত বসবার যায়গা পেতুম না, কিন্তু, খাণ্ডোয়ার কুমারবাবু প্রমুখ বাঙ্গালীদের দেওয়া আমাদের গলায় বড় বড় ফুলের মালা দেখে যাত্রীরা আমাদের সসম্ভ্রমে যায়গা ছেড়ে দিলে!

গাড়ী খাণ্ডোয়া ষ্টেশন না-ছাড়া পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের কামরার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যথাসময়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে। তখন দেখা গেল যে, আমার দামী টুপিটা খাণ্ডোয়া ষ্টেশনে ওয়েটিং-রুমেই পড়ে আছে। সেটাকে আসবার সময় আর তুলে আনা হয়নি!

জলধর দাদা আমার টুপী হারানোর কথা শুনে খুব বকলেন এবং আমার হাতে আর একটা আংটি রয়েছে দেখে সেটাকে খুলে তুলে রাখতে

বললেন, নইলে সেটাও না কি আমি হারাবো! গুরুজনের আদেশ অবহেলা করা উচিত নয়, বিশেষ একটা আংটি ও টুপী যখন হারালো, তখন এটার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা ক'রে আমি তৎক্ষণাৎ সে আংটিটি খুলে কাগজে মুড়ে আমার ওভার-কোটের ভিতর দিকের বুক-পকেটে রেখে দিলুম। এইখানেই ব'লে রাখি, ভ্রমণ-শেষে কলিকাতায় ফিরবার পর খাণ্ডোয়ার পুলিশের কার্য্যতৎপরতায় আমার সে আংটিটি পাওয়া গিয়েছিল, আমিও প্রতিশ্রুত দশটী টাকা খাণ্ডোয়ার পুলিশ ইন্স্‌পেক্টর মহাশয়কে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু জলধরদা'র কথায়, হারাবার ভয়ে যে দ্বিতীয় আংটিটি পকেটে রেখেছিলাম, তিনি যে কবে, কোথায়, কেমন করে অন্তর্হিত হয়েছিলেন, সে আজও জান্‌তে পারিনি।

রাত্রি প্রায় এগারোটা নাগাদ গাড়ী ভুসাওয়াল জংসনে এসে পৌঁছিল। ডাক্তার সতীশদাস আমাদের নিকট বিদায় নিয়ে অতি ক্ষুণ্ণ-মনে চলে গেলেন। এই সদানন্দ সরল বিনয়ী বন্ধুটির সঙ্গ ছাড়তে হ'লো ব'লে আমাদের সকলেরই মন একটু ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো।

ভুসাওয়ালের একটি ষ্টেশন পরেই জালগাঁও জংসন। অজন্তার যাত্রীদের এইখানেই নামতে হয়। আমরা রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ জালগাঁও জংশনে এসে নামলুম। রাত্রের মতো ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমেই থাকার ব্যবস্থা করা গেল। স্থির হ'লো, পরদিন অতি প্রত্যূষে একখানি মোটর নিয়ে আমরা অজন্তা দেখতে যাবো। অজন্তা এখান থেকে মাত্র সাঁইত্রিশ মাইল দূরে।

ষ্টেশনের ধারে খাবারের দোকানে যা পাওয়া গেল তাই কিছু কিছু কিনে এনে বঙ্কিমবাবু ও দিবাকরবাবু তাঁদের রাত্রিভোজন সমাপ্ত করলেন। আমি ও জলধরদাদা শুধু দু'কাপ চা ও সামান্য কিছু মিষ্টান্ন খেলুম। তারপর ওয়েটিং-রুমের বড় বড় বেতের বেঞ্চি ও ইজিচেয়ারগুলিতে কম্বল

বিছিয়ে যে যার শুয়ে পড়লুম। জলধরদাদা বললেন, পা-দুটো বড় কামড়াচ্ছে হে নরেন, কাউকে ধরে একটু টিপিয়ে নিতে পারলে হ'তো। আমি ষ্টেশনের একজন কুলিকে কিছু দিয়ে দাদার পা টেপাবার ব্যবস্থা করে দিলুম।

একটি বর্ম্মা-চুরুট টানতে টানতে পা টেপানোর আরাম পেয়ে দাদা ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি কুলিটিকে বিদায় করে ওয়েটিং-রুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আলোটি কমিয়ে শুয়ে পড়লুম এবং অজন্তার স্বপ্ন দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম কিছুই টের পাইনি।

পরদিন ভোর পাঁচটায় দাদা আমাদের ডেকে তুলে দিলেন। সবাই উঠে প'ড়ে মুখহাত ধুয়ে, চা ও জলযোগ সেরে অজন্তা যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে সেই মুসলমান যুবকটির নির্দ্দেশ-মত ঠিকানায় ষ্টেশনের একজন চাপরাশীকে মোটর আনতে পাঠিয়ে দিলুম। অবিলম্বে সে একখানি সুন্দর মোটর গাড়ী এনে হাজির করলে। কিন্তু সে গাড়ীখানি অজন্তায় যেতে আসতে চল্লিশ টাকা ভাড়া চাইলে ব'লে, তাকে বিদায় করে দিয়ে আমরা অন্য মোটরের সন্ধান করতে বেরুলেম ; কারণ আমরা শুনেছিলুম জালগাঁও থেকে কুড়ি টাকায় অজন্তা যাতায়াতের জন্য মোটর পাওয়া যায়। পেলুমও তাই।

আমাদের বাক্স-বিছানা প্রভৃতি মালপত্র সমস্ত ষ্টেশন-মাষ্টারের জিম্মায় রেখে, আমরা বেলা সাতটার মধ্যেই অজন্তায় রওনা হলুম। পথে একটি হোটেল দেখতে পেয়ে সেখান থেকে কিছু পাঁউরুটি. কলা ও মিষ্টান্ন কিনে নিলুম। সারাদিন অজন্তা-গুহায় কাটাতে হবে ; সুতরাং আজকে এই পাঁউরুটি ও কলার সাহায্যেই মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিতে হবে স্থির হ'লো। এখানকার 'মিষ্টান্ন' দেখলুম 'পেঁড়া' জাতীয়, কিন্তু, ক্ষীরের পরিবর্ত্তে চিনির প্রাধান্য খুব বেশী।

আমাদের মোটর শীঘ্রই সহর ছাড়িয়ে এসে মাঠের রাস্তা ধরলে। জালগাঁও সহরটি ছোট হ'লেও রাস্তাঘাট বেশ ভালো। বড় বড় বাড়ীঘরও যথেষ্ট। দোকানপাট ও হাটবাজারেরও অভাব নেই দেখলুম। পথে দু' একটি তূলোর কলও চোখে পড়লো।

এখানকার মোটর-ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই মুসলমান এবং অতিশয় ভদ্র। আমাদের গাড়ী একটু জোরে চালিয়ে নিয়ে যেতে বলায় তৎক্ষণাৎ তারা গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিলে। টানা চব্বিশ মাইল চলে এসে আমাদের গাড়ী কিছুক্ষণের জন্য পাহুরে থামলো। পাহুর থেকে অজন্তার দূরত্ব আর তেরো মাইল মাত্র। যে পথে মোটর-বাস যাত্রী নিয়ে অনবরত যাতায়াত করে, পাহুর সেই পথের একটা মস্ত ঘাঁটি। এইখানে উত্তর বা দক্ষিণ দিকের দূরের যাত্রীদের বাস্ বদল করতে হয়। আমাদের মোটর-গাড়ীর চালক ও পরিচারক পাহুর থেকে তাদের নিজেদের জন্য কিছু খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ করে নিলে দেখলুম।

পাহুর একেবারে ইংরাজ অধিকারের সীমানায়। এর পর থেকেই নিজাম রাজ্য আরম্ভ হ'য়েছে। অজন্তা নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। জালগাঁও থেকে অজন্তা যাবার পথে পথিকদের জন্য রাস্তার ধারে বরাবর দণ্ড-সংলগ্ন কাষ্ঠফলকে পথ-নির্দ্দেশ জ্ঞাপন করা রয়েছে, দেখা গেল। এক যায়গায় আমরা দেখলুম একটি কাষ্ঠফলকে লেখা রয়েছে 'The Ghat begins'। খানিকদূর এগিয়ে দেখি আর একখানি কাষ্ঠফলকে লেখা রয়েছে 'The Ghat ends', আমরা এটাকে সুনিশ্চিত ভারতের পশ্চিম ঘাট বলেই ধ'রে নিলুম। নিজাম রাজ্য যেখান থেকে সুরু হ'য়েছে, সেখানেও একটি কাষ্ঠফলকে সে কথা লিখে পথিকদের বিজ্ঞাপিত করা হ'য়েছে।

অজন্তা যাবার পথে দু'ধারে কেবল তূলোর চাষই চ'খে পড়লো।

কাজল-ডেলার মতো কুচকুচে কালো মাটির ক্ষেত। পথে-ঘাটে যে সব মেয়েদের দেখা গেল, তাদের আকৃতি ও পরিচ্ছদের সঙ্গে অজন্তা গুহায় চিত্রিত মেয়েদের যেন কোথায় একটু ক্ষীণ অস্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে বলে মনে হ'তে লাগলো। এ অঞ্চলের মেয়েরা কেউ গৌরাঙ্গী নয় সকলেই প্রায় শ্যামা! কিন্তু, তাদের সুগঠিত দেহে পরিপুষ্ট যৌবন ও অটুট স্বাস্থ্য এমন একটি সুন্দর শ্রী দান করেছে যে, তা পথিকের দৃষ্টিকে প্রীত করে, পীড়িত করে না।

অজন্তা

বেলা সাড়ে নটার মধ্যেই আমরা অজন্তার গিরি-গুহাবলীর মূলে গিয়ে পৌঁছলুম। একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর তীরে এক অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি অনতি-উচ্চ পর্ব্বত যেন সোজা উপরে উঠে গেছে। কোথাও এতটুকু ঢালু নয়। নীচে থেকে উপরের পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য স্তম্ভ ও তোরণ দেখে মনে হচ্ছিল, আমরা যেন কোনও প্রাচীন রাজ্যের এক বিরাট পার্ব্বত্য-প্রাসাদের সম্মুখে এসে পড়েছি। পার্ব্বত্য নদীটির নাম শুনলুম 'বাঘোরা'! এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর! চারিদিকে যেন তপোবনের একটা স্তব্ধ শান্তি বিরাজ করছে! মহামান্য নিজাম বাহাদুর অজন্তা-দর্শনাভিলাষী তীর্থযাত্রীদের জন্য পাহাড়ের উপরে পৌঁছবার চমৎকার একটি সিঁড়ি তৈরী ক'রে দিয়েছেন! সেই সিঁড়ি দিয়ে আমরা পাহাড়ের উপরে উঠে গেলুম। পাহাড়টি প্রায় ২৫০ ফিট উঁচু হবে। অশ্বখুরের মত একদিক থেকে আর একদিক পর্য্যন্ত ঘুরে গেছে।

প্রথমেই ১নং গুহা। এই এক নম্বর গুহার একধারে দেখলুম একটি ছোট্ট চায়ের দোকান রয়েছে। এখানে চা, কেক্‌, রুটি ও ডিম পাওয়া যায়। 'গুহা' বলতে যে সঙ্কীর্ণ পর্ব্বত-গহ্বরের কথা আমাদের মনে হয়, এগুলি তা নয়। এই গুহাগুলিকে পর্ব্বত-কন্দরস্থ প্রাসাদ বলা চলে।

এক নম্বর গুহা থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় পাশাপাশি ২৯টি গুহায় এই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়টি যেন শিল্পীর মৌচাক হ'য়ে আছে। গুহাগুলি

অজন্তার নারী (১নং গুহা)

'চৈত্য' ও 'বিহার' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যেখানে ভক্তগণ সমবেত হ'য়ে উপাসনা ক'রতেন, তাকে বলে 'চৈত্য'; আর যেখানে ভিক্ষু সন্ন্যাসীরা বাস করতেন, তাকে বলে 'বিহার'। চৈত্যগুলির মধ্যে তথাগত বুদ্ধের এক একটি স্তূপ নির্ম্মিত আছে। ২৯টি গুহার মধ্যে পাঁচটি 'চৈত্য'। বাকী সবগুলিই 'বিহার'। দেখলেই বোঝা যায়, এটি একসময় বৌদ্ধদের একটি প্রধান আশ্রম ছিল।

একমাত্র 'ইলোরা গুহা' ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও আর প্রাচ্যের প্রাচীনতম স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রাঙ্কন-শিল্পকলার এমন বিরাট নিদর্শন একত্র দেখতে পাওয়া যায় না। অজন্তা ও ইলোরার তুলনায় 'বাঘগুহা' 'কারলী' বা 'এলিফাণ্টা' প্রভৃতিকে ক্ষুদ্র ব'লে মনে হয়! অজন্তার খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী থেকে আরম্ভ ক'রে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় বৌদ্ধশিল্পের একটি ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়। সাতশ' বছর ধরে বৌদ্ধ-যুগের শিল্পীরা এই পর্ব্বত-গাত্রে তাঁদের অসামান্য কলা-নৈপুণ্যের যে বিপুল পরিচয় রেখে গেছেন, তার মূল্য শুধু শিল্প হিসাবেই নয়, তদানীন্তন সমাজের রীতি-নীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার এবং আচার-ব্যবহার প্রভৃতিরও যে সন্ধান এর মধ্যে পাওয়া যায়, ইতিহাসের দিক দিয়ে তার মূল্যও অনেক। অজন্তার স্থাপত্য-কলা, অজন্তার ভাস্কর্য্য, অজন্তার রঙীন প্রাচীর-চিত্রগুলি দেখতে দেখতে যখন দর্শকের মনে ভারতের গৌরবময় যুগের একটি অনবদ্য ছবি ফুটে ওঠে, তখন বিস্ময়ে, পুলকে, শ্রদ্ধায় মাথা নত ক'রে, প্রাচীন ভারতের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার না ক'রে পারা যায় না; কারণ, পৃথিবীর আর কোথাও না কি ঠিক এমনটি আর নাই!

প্রত্যেক গুহার বিশেষত্ব হচ্ছে—একটু একটু ক'রে পাহাড়টির ভিতর দিক কেটে বা কুঁদে অসংখ্য স্তম্ভ-পরিবৃত এক একটি চৈত্য ও

বাইরে হলের সম্মুখে প্রশস্ত বারান্দা বা দরদালান। প্রবেশ-দ্বার ও বাতায়ন বৌদ্ধযুগের কারুকার্য্য-খচিত স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত।
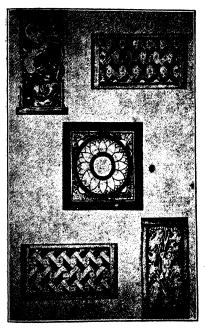
১নং গুহার ছত্রতলে চিত্রকরের তুলিকায় নানা বিভিন্ন সুন্দর পরিকল্পনা

হলের ভিত্তিগাত্রের বহির্ভাগও যেমন চিত্রিত, ভিতরেও চারিদিক সেইরূপ চিত্রিত।

বাইরের বারান্দায় ছটি অপরূপ কারুকার্য্য-খচিত বিপুলকায় স্তম্ভ রয়েছে। হলের অভ্যন্তরেও চার কোণে চারটি ছাড়া, চার পাশেও চারটি চারটি করে ষোলটি স্তম্ভ আছে। স্তম্ভগুলি একই রকম দেখতে, একই রকম স্থাপত্য-কলা ও কারুকার্য্য-মণ্ডিত; দেখে মনে হয় যেন ছাঁচে ঢেলে তৈরী করা!

প্রধান হলটির চারপাশে আবার অনেকগুলি ছোট ছোট কুঠরি রয়েছে দেখলুম। প্রবেশ-দ্বারের ঠিক ঋজু-ঋজু হলের বিপরীত দিকে একটি গর্ভমন্দির আছে। এই গর্ভমন্দিরের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের একটি বিরাট মূর্ত্তিও রয়েছে। প্রধান হল থেকে গর্ভমন্দিরে যেতে মধ্যে আবার একটি ছোট দালান আছে। এ দালানটিরও সামনে দুটি স্তম্ভ দেখা গেল এবং দুই প্রান্তভাগের ভিত্তি-গাত্রে দুটি অর্দ্ধবৃত্তাকার স্তম্ভ রয়েছে। এই ছোট দালানটির চারি দিকের ভিত্তি-গাত্রে অসংখ্য বুদ্ধমূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা আছে।

ভিত্তি-গাত্রের সুরঙ্গীন চিত্রগুলি ও ভাস্কর্য্য সবই প্রায় দেখলুম বৌদ্ধ জাতক সংক্রান্ত। শিবীজাতক, শঙ্খপাল জাতক, বোধিসত্ত্ব, বুদ্ধের প্রলোভন বা বুদ্ধ পরীক্ষা, শ্রাবস্তীর অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদি জাতকের প্রত্যেকটি গল্পকে চিত্র ও ভাস্কর্য্যে রূপ দেওয়া হ'য়েছে। গল্পকে চিত্রের মধ্যে এমন করে ফুটিয়ে তোলার কৌশল না কি পৃথিবীতে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

প্রধান হলটির চারি-পাশ বেশ অন্ধকার। ভাল করে কিছু দেখা যায় না! কিন্তু গর্ভমন্দিরের বুদ্ধমূর্ত্তিটি প্রবেশ-পথের ভিতর থেকে এসে-পড়া দিনের আলোয় সতত সমুজ্জ্বল! প্রত্যেক গুহার মধ্যেই এই বিশেষত্বটা সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে।

১নং স্তম্ভের ছাতলের কারুকার্য্য

আমাদের সঙ্গে বৈদ্যুতিক আলোর মশাল ছিল (Electric Torch) তারই সাহায্যে আমরা বেশ ভালো করে ছবিগুলি দেখেছিলুম। যাঁদের সঙ্গে আলো থাকেনা, তাঁরা যদি দুটাকা খরচ করেন, তা'হলে অজন্তার প্রহরীরা দর্পণে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত করে অন্ধকার গুহার মধ্যে ছবি-গুলিকে আলোকে উজ্জল ক'রে তোলে। বৈদ্যুতিক আলোকে গুহা আলোকিত ক'রে তুলবার ব্যবস্থা নিজাম সরকার ক'রে রেখেছেন ; কিন্তু, সে একটু ব্যয়সাধ্য ; পনেরো টাকা জমা দিলে তবে কর্তৃপক্ষ অজন্তার প্রত্যেক গুহাটি বিজলী দীপ্তিতে আলোকিত ক'রে দেবার ব্যবস্থা করেন।

আমরা যেদিন অজন্তায় গিয়েছলুম, সেদিন সৌভাগ্যক্রমে অজন্তার যিনি রূপ-রক্ষক বা শিল্প-ভাণ্ডারী (Curator) শ্রীযুক্ত সৈয়দ আহমেদ, একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলা, একজন উচ্চবংশীয়া মারহাট্টি মহিলা ও একজন মুসলমান ভদ্রলোককে নিয়ে অজন্তা দেখাতে এসেছিলেন। মহিলাদ্বয় রূপসী, বিদুষী ও তরুণী। মুসলমান মহিলাটি 'পর্দ্দানসীন' একেবারেই নন ; মারহাট্টি মহিলাটির তো ও আপদ নেই-ই ; কাজেই তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে আমাদের কোনও বাধা হয়নি। সেই জন্য অজন্তা পরিদর্শনের সুযোগ পাওয়া গিয়েছিলো খুব ভাল !

তাঁরা অনর্গল ইংরাজীতে কথা বলছিলেন এবং হাস্য-পরিহাসে ও চিত্রসন্দর্শনজনিত উল্লাসময় কলরবে অজন্তার নিভৃত নিস্তব্ধ গুহারাজ্যকে যেন জীবন্ত ও মুখরিত করে তুলেছিলেন। তাঁদের পরেই কয়েকজন ইংরাজ মহিলা এবং রাজ-কর্ম্মচারী এলেন। একজন ফরাসী পর্য্যটকের সঙ্গেও দেখা হ'ল। তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে অজন্তা সম্বন্ধে অনেক কথা আমাদের জিজ্ঞাসা ক'রলেন এবং তাঁর নিজের এ সম্বন্ধে মতামত উচ্ছ্বসিত হয়ে জানালেন।

সপরিবারে একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোকও অজন্তার যাত্রী হয়েছিলেন

সেদিন, এবং জলধরদাদার চেয়েও অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ এক মারাট্টি যাত্রীকেও দেখলুম সেই পাহাড়ে উঠেছেন—যেন তাঁহার মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে—অতীত ভারতের বিগত-সমৃদ্ধির প্রাচীন গৌরব-নিদর্শনগুলি জীবনে এই শেষ বারের জন্য দেখে তিনি পরলোকের পাথেয় সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যেতে এসেছেন।

১নং গুহার প্রসিদ্ধ চিত্র-দম্পতী

এক নম্বর গুহা দেখতেই আমাদের অনেকক্ষণ সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। 'দর্শকের লিপি'তে (Visitors' book) আমাদের মতামত লিখে যখন এক নম্বর গুহা থেকে আমরা নিষ্ক্রান্ত হলুম, তখন আমাদের খেয়াল হ'লো যে, মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজকেই অজন্তার ২৯টি গুহার পর্য্যবেক্ষণ

শেষ করে আমাদের জালগাঁও ফিরতে হবে—এখনও 'ইলোরা' যাওয়া বাকী আছে! এতক্ষণ আমরা যেন সেই বিগত বৌদ্ধযুগের স্বপ্ন-রাজ্যের মধ্যে আত্মহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম ; মনে হচ্ছিল যেন সেই দুহাজার বছর আগে একদিন এখানে আমরা বাস ক'রে গেছি। এ যেন আমাদের কোন্ এক জন্মান্তরের পূর্ব্ব-স্মৃতি-বিজড়িত আবাসভূমি!

এক নম্বর গুহা থেকে বেরিয়ে আমরা দু'নম্বর গুহার মধ্যে প্রবেশ করবার সময় স্থির করলুম যে, আর এত পরিপূর্ণরূপে উপভোগ ক'রে দেখতে গেলে একদিনে ২৯টি গুহা দেখা চলবেনা, ২৯দিন লেগে যাবে। অতএব একটু দ্রুতবেগে দর্শন শেষ ক'রতে হবে।

অজন্তা গুহাবলীতে যে 'এক' 'দুই' ক'রে ধারাবাহিক নম্বর দেওয়া আছে, সেগুলি পরের পর দেওয়া হয়েছে কেবল-মাত্র দর্শকের সুবিধার জন্য। শৈল-সোপান উত্তীর্ণ হয়ে পর্ব্বতশিখরদেশে পৌছাবামাত্র যে গুহাটি প্রথম দর্শকদের সামনে পড়ে, সেইটিকেই এক নম্বর দিয়ে তার পরেরটিকে দুই—তার পরেরটিকে তিন—এমনি করে পাশাপাশি গুহাগুলির পরের পর নম্বর দেওয়া হয়েছে। যুগ-বিভাগ বা প্রাচীনত্বের হিসাব করে এই সংখ্যা-নির্দ্দেশ হয়নি। যেমন 'অজন্তা' গুহার যেটিতে এক নম্বর পড়েছে—সেটি অজন্তার প্রথম গুহা নয়—সেটি বরং সর্ব্বশেষ গুহা বলা যেতে পারে, কারণ তার নির্ম্মাণ-কাল সপ্তম শতাব্দী ব'লে নির্দ্ধারিত হয়েছে।

বহুকাল এই অজন্তার ঐশ্বর্য্য অনাবিষ্কৃত পড়ে ছিল। কারণ, চারি দিক জঙ্গলময় পর্ব্বতে বেষ্টিত এমন একটি নির্জ্জন গুপ্তস্থানে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল যে, বাইরের লোকের পক্ষে সহজে এর সন্ধান পাওয়া সম্ভব ছিল না। বৌদ্ধযুগ ও বৌদ্ধ-প্রভাব বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনশূন্য পরিত্যক্ত অজন্তা যেন অভিমান-ভরে লোক-লোচনের অন্তরালেই

অজ্ঞাতবাস ক'রছিল। মাত্র একশত বৎসর পূর্ব্বে কৌতূহলী ইংরাজের আগ্রহ, উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসার ফলে অজন্তা আবার যেন নূতন ক'রে আবিষ্কৃত হ'য়েছিল।

১৮১৯ খৃঃ অব্দে একদল ইংরাজ সৈনিকের ইন্দ্যাদ্রি পর্ব্বত অভিযান-কালে সর্ব্বপ্রথম অজন্তার অস্তিত্ব জানতে পারা যায়। ১৮২৯ খৃঃ অব্দে সার জেম্‌স্ আলেক্‌জ্যাণ্ডার বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীর মুখপত্রে অজন্তা গুহার বিবরণ ও চিত্রকলা সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরে ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের মুখপত্রে অজন্তার আর একটি বিবরণ প্রকাশিত হ'য়েছিল। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে লেফ্‌টেনাণ্ট্ ব্লেক্ 'বোম্বে কুরিয়ার' পত্রে অজন্তা সম্বন্ধে একটি বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেন। তার পর ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে ফার্‌গুসান্ সাহেব বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় অজন্তার বিশেষত্ব, চমৎকারিত্ব ও অসাধারণত্বের উল্লেখ করে তার একটি সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন। এই রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির চেষ্টায় ও অনুরোধে ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মেজর রবার্ট গিলকে অজন্তার চিত্রাবলীর নকল তুলে আনবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ধরে অজন্তার যে চিত্রাবলী সংগ্রহ করেছিলেন, ১৮৬৬ সালের একটি প্রদর্শনীতে সেগুলি বিলাতে দেখানো হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আগুন লেগে প্রদর্শনীটি পুড়ে যাওয়ায় সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়; কেবল যে পাঁচখানি ছবি শেষে গিয়ে পড়ায় প্রদর্শনীতে পাঠান হয়নি, সেই পাঁচখানি রক্ষা পায়। এই পাঁচখানি ছবি সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়মে ভারতীয় কলাবিভাগে এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে।

পরে ফারগুসান্ সাহেবের আগ্রহে ও চেষ্টায় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বোম্বাই আর্ট স্কুলের যিনি প্রধান অধ্যক্ষ, মিঃ জর্জ্জ গ্রিফিথ্‌স্‌কে

অজন্তার চিত্রাবলীর পুনর্ব্বার নকল নেবার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তিনি দশ বৎসর ধ'রে তাঁর কয়েকজন ছাত্রের সাহায্যে কার্য্য করে প্রায় ১৪৫ খানি ছবির নকল তুলেছিলেন! কিন্তু, আবার দৈবদুর্ব্বিপাকে আগুন লেগে তাঁর প্রায় ৮৭ খানি ছবি পুড়ে গেছল। বাকী ৫৬ খানি এখন বিলাতের ভিক্টোরিয়া ও এ্যালবার্ট মিউজিয়মের ভারতীয় বিভাগে রক্ষিত হ'য়েছে, এবং দুখানি বোম্বাইয়ের আর্ট স্কুলের তত্ত্বাবধানে আছে। এই কয়খানি ছবি নিয়েই ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে গ্রিফিথ্‌স্‌ সাহেবের অজন্তা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ বইখানি প্রকাশিত হ'য়েছিল।

তার পর ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে লেডী হেরীঙ্গ্‌হাম্‌ তিনবার বিলাত থেকে এসে 'অজন্তা' দেখে গিয়েছিলেন ও ছবি এঁকে নিয়ে গেছলেন। ১৯১৫ সালে তাঁর বিখ্যাত বই 'অজন্তা ফ্রেস্কোস্‌' প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯১৪ সাল থেকে নিজাম সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ অজন্তাগুহা রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ ক'রে ভারতের অতীত গৌরবের এই বিরাট নিদর্শনটিকে ধ্বংসের হাত থেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন। বহু অর্থব্যয় ক'রে তাঁরা ইটালীর দু'জন সুদক্ষ প্রাচীর-চিত্র-রক্ষণাভিজ্ঞকে আনিয়ে অজন্তার ছবিগুলির আয়ু বৃদ্ধি করিয়েছেন। ১৯১৯।২০ সালে বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী পণ্ডিত ও প্রাচ্য তত্ত্ববিশারদ মুশেঁ ফুশেকে তাঁরা প্রচুর পারিশ্রমিক দিয়ে দু' বৎসরের জন্য এখানে আনিয়েছিলেন। অজন্তার প্রত্যেক ছবির ব্যাখ্যা, তার শিল্প-পদ্ধতি ও ভাস্কর্য্যের বিশেষত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য-সম্বলিত একটি বিশদ বিবরণ তাঁরা শীঘ্রই প্রকাশ ক'রছেন। তাতে অজন্তার চিত্রগুলিও অবিকল যথাযথ রংএ মুদিত করে দেবারও ব্যবস্থা হ'য়েছে শুনলুম।

অজন্তার সবচেয়ে পুরাতন গুহা হ'চ্ছে ৯নং ও ১০নং। এ দুটি আনু-

মানিক খৃঃ পূর্ব্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে বা তৎপূর্ব্বে নির্ম্মিত হ'য়েছিল। এবং সবচেয়ে হালে তৈরী হ'য়েছিল ১নং ২নং ও ২৬নং গুহা। এগুলি
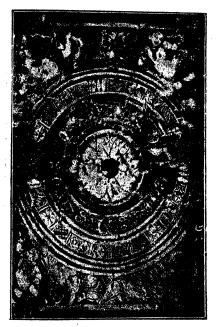
২নং গুহার ছত্রতলের মধ্য-চিত্র

আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। এর পর থেকেই ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধপ্রভাব দ্রুত বিলুপ্ত হ'য়েছিল।

প্রত্যেক গুহার প্রবেশ-দ্বার দেখলুম পৃথক। একটি গুহা থেকে আর একটি গুহায় যাবার কোনও সুড়ঙ্গ-পথ নেই। পুরাতন গুহাগুলির প্রবেশ-দ্বার ভাস্কর্য্য, ও স্থাপত্য-কলার অপূর্ব্ব নিদর্শনে অলঙ্কৃত। হস্তী, নগরাজ,

৬নং গুহার সম্মুখস্থ বারান্দার চিত্রিত ছত্র-তলে

দ্বারপাল প্রভৃতির বিরাট মূর্ত্তি খোদিত রয়েছে। প্রাচীর-গাত্রে ও চন্দ্রাতপের চিত্রে ফুল, লতাপাতা, পশুপক্ষী, নরনারী প্রভৃতি অজন্তার

সমস্ত ছবিগুলিতে মোটে পাঁচটি রং ব্যবহার করা হ'য়েছে। পাহাড়ের ভিতর থেকে কেটে বার করা সেই পাথরের দেওয়ালে ও ছত্রতলে প্রথমে তুষ ও গোবর-মাটি লেপে তার উপর পঙ্কের কাজ করা হ'য়েছিল।
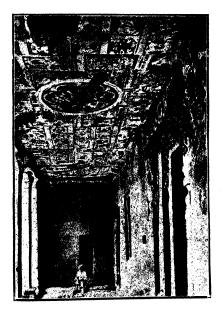
১৭ নং গুহার বারান্দার চিত্রিত ছত্রতলে

তার পর সেই দেবালয়ের গায়ে ও ছত্রতলে শিল্পীরা পাঁচটি রংয়ের সাহায্যে বহুবর্ণ চিত্র এঁকেছেন। কোথাও তেলের রং ব্যবহার হয়নি। সমস্ত

রংই জলে-গুলে আঁকা। অথচ আজ এই দু হাজার বছর পরেও দেখে মনে হয় শিল্পী যেন এই-মাত্র আঁকা শেষ ক'রে উঠে গেলেন! সে রংয়ের জেল্লা কোনো কোনো ছবিতে এখনও এমন টাট্‌কা রয়েছে।

১ নং গুহার ছত্রতলের চিত্র—পারস্য-দূতের সংবর্দ্ধনা

অজন্তা গুহার মধ্যে কয়েকটির ভিতরে ও কয়েকটির বাহিরে প্রাচীন লিপি খোদিত রয়েছে দেখা গেল।

একটির পর একটি করে আমরা অজন্তার ২৯টি গুহা দেখা শেষ করলুম যখন, তখন সূর্য্য পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিমে হেলে পড়েছে। প্রত্যেক গুহার বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়, এবং আবশ্যকও নেই। কারণ,

১২ নং গুহার অভ্যন্তর দৃশ্য (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে নির্মিত)

সব গুহাগুলিই উল্লেখযোগ্য নয়; আমি শুধু কয়েকটী প্রধান গুহার চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-কলার কিছু কিছু উল্লেখ করে আমার অজন্তার বিবরণ শেষ করবো।

চিত্র হিসাবে শুধু ১ নং ২ নং ৯ নং ১০ নং ১৬ নং ও ১৭ নং গুহা—মাত্র এই ছ'টি উল্লেখযোগ্য।

এক নম্বর গুহায় বৌদ্ধ জাতকের যে সব চিত্র আছে, তার উল্লেখ পূর্ব্বেই করেছি। কেবল একটি ছবির কথা এখনও বলা হয়নি। সেটি বারান্দার ছত্রতলে দেখতে পাওয়া যায়। একটি তুর্কী বা পারস্য জাতীয় সম্ভ্রান্ত দম্পতি সিংহাসনে বসে আছেন। পদতলে পূজাসম্ভার নিয়ে দুটি ভৃত্য উপবিষ্ট। দু'পাশে দুজন পরিচারিকা। বিশেষজ্ঞেরা এ ছবিখানির নাম দিয়েছেন "পারস্য-দূত"।

২ নম্বর গুহাটি এক নম্বরের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট। অজন্তার সব গুহা সমান নয়। ২ নম্বর গুহাতেও বৌদ্ধ জাতকের ছবি আছে, যেমন—ক্ষণিত্ববাদী জাতক, হংসজাতক প্রভৃতি। তা ছাড়া, বুদ্ধদেবের বর্ত্তমান জন্মেরও বহু বিবরণ চিত্রিত আছে। যেমন বুদ্ধ-জননী মায়াদেবীর সেই ষড়দন্তী শ্বেত-হস্তীর স্বপ্ন-দর্শন। বুদ্ধের জন্ম, সপ্ত-সোপান প্রভৃতি। অজন্তার বিখ্যাত ভগ্নদূতের ছবিটি এই দু'নম্বর গুহায় আছে। স্তম্ভগাত্রে লীনা তরুণীর চিত্রটিও এখানে আছে। দু'নম্বর গুহার সবচেয়ে সুন্দর ছবি হ'চ্ছে কোষমুক্ত তরবারি করে সম্ভবতঃ কোনও নৃপতি এক অপরাধিনী সুন্দরীকে হত্যা ক'রতে উদ্যত হ'য়েছেন। সুন্দরী নতজানু হ'য়ে রাজপদে মস্তক লুটিয়ে দিয়ে যুক্তকরে নৃপচরণ স্পর্শ করে সম্ভবতঃ ক্ষমা ভিক্ষা ক'রছে। নিকটেই একটি মেয়ে নতমুখে গালে হাত দিয়ে বসে আছে, যেন বিষাদের জীবন্ত প্রতিমা! এ ছাড়া আরও দুটি নারী ও একটি পুরুষের চিত্র আছে এই ছবির মধ্যে, তাদেরও ভাবভঙ্গী অপূর্ব্ব!

১৭ নং গুহার বারান্দার দেওয়ালের চিত্র
(রাজপ্রাসাদের বাহির ও অন্তঃপুরের দৃশ্য)
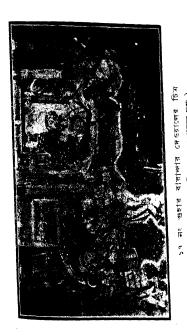
প্রাচীনতম গুহা-দ্বারের মধ্যে ৯নং চৈত্য-গুহার উল্লেখযোগ্য চিত্র হচ্ছে রাখালের দল উল্লাসে ছুটে চলেছে তাদের গোপালের পশ্চাতে। স্তম্ভ-গাত্রে প্রভু বুদ্ধের ঋজু মূর্ত্তিগুলিও প্রাচীন চিত্রকলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যেতে পারে।

চৈত্য-গুহা কয়েকটির মধ্যে ১০ নং গুহাটিই হ'চ্ছে সবচেয়ে বড়! এখানেও সারি-সারি স্তম্ভগাত্রে প্রভু বুদ্ধের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। কিন্তু, পশ্চাদ্দিকের প্রাচীর-গাত্রে ভীল প্রভৃতি আদিম জাতিদের যে অপরূপ সুষমামণ্ডিত চিত্রশ্রেণী আছে, সেটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য!

১৬ নং গুহার প্রসিদ্ধ চিত্র হচ্ছে—"নৃপসুতার তনুত্যাগ!" গুহাভ্যন্তরের বামদিকের দেওয়ালে এই অপূর্ব্ব চিত্রটি আঁকা আছে। শিল্পীর রূপদক্ষতার এমন নিপুণ পরিচয় অতি অল্পই চোখে পড়ে! এখানকার ছত্রতলের ও ভিত্তি-গাত্রের অলঙ্কার চিত্রগুলিও উল্লেখযোগ্য। ভল্ল ও ধনুর্ধারী কিরাত ও বনচর বর্ব্বর-দল। হরিণ, পাখী, বানর, হাতী প্রভৃতি বন্য-জন্তু, তরুলতা, ফল ফুল-নদী পর্ব্বত, ঝরণা, কিন্নরী অপ্সরা, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, শঙ্খ-পদ্ম, চক্র, মৎস্য, দ্বারপাল, কীর্ত্তিমুখ প্রভৃতি যে কোনও চিত্রেই একটা শিল্প-বৈশিষ্ট্য ও কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

অজন্তা-চিত্রাবলীর মধ্যে রাজা, রাণী, রাজকুমারী, সেনাপতি, মন্ত্রী, দাসদাসী, নর্ত্তকী, পরিচারিকা, ভৃত্য, এবং উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত নরনারী, ধনী, বণিক, ভিক্ষু সন্ন্যাসী প্রভৃতির আকৃতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, উত্তরীয়, বক্ষবাস, কটিবাস, অলঙ্কার, মুকুট, সিঁথি, কেয়ূর, কুণ্ডল, অঙ্গদ, বলয়, কণ্ঠহার, মুক্তাজাল, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, মেখলা, কাঞ্চী, বাজুবন্ধ, মণিবন্ধ, কটিবন্ধ, নূপুর প্রভৃতি অসংখ্য বিভিন্ন প্রকার বেশ ও অলঙ্কারের এত বেণী ইতর-বিশেষ আছে যে, পদমর্য্যাদায় কে ছোট, কে বড়, অতি সহজেই তা জানতে পারা যায়। অজন্তার চিত্রিত নরনারীর অঙ্গে

অলঙ্কারগুলি এমন সুদৃশ্য, সুন্দর ও শোভন যে, এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না, সে যুগের লোকদের রুচি বেশ সুচারু ছিল এবং তাঁরা সকলেই কলাবিদ্ ও সৌখীন মানুষ ছিলেন।

১৭ নং গুহার বারান্দার দেওয়ালে চিত্রিত গন্ধর্ব্ব অপ্সরা প্রভৃতি বিমানচারিগণ (দক্ষিণে বিখ্যাত বেণুবাদিনীর চিত্র দ্রষ্টব্য)

১৬ নং গুহার 'সুতসোম' 'নন্দের দীক্ষা' প্রভৃতি 'জাতক' ছাড়া ভগবান বুদ্ধের এবারকার জন্ম, ঋষি অসিত কর্ত্তৃক তাঁর কোষ্ঠীপত্র পাঠ, বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা, তাঁর সাধনা, ধ্যান, তাঁর রাজগৃহে প্রথম পদার্পণ, যুবরাজ-রূপে নগর প্রদক্ষিণকালে তাঁর প্রথম ব্যাধি, দৈন্য, জরা ও মৃত্যুর

সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ এবং সুজাতার নৈবেদ্য গ্রহণ, প্রভৃতি চিত্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৭ নং গুহার প্রধান বিশেষত্বই হচ্ছে এর চিত্র-প্রাচুর্য্য। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—"সংসারচক্র"। সিংহাসনে বা পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট কোনও সম্ভ্রান্ত দম্পতি, সখীগণে পরিবৃতা ছত্রতলে দণ্ডায়মানা একজন রাণী এবং বাতায়নে বা গবাক্ষপথে উঁকি মারছে কৌতূহলী দুটি মেয়ে!

১৭ নং গুহার আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এর বিমানচারী গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরাদের চিত্র! শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান এই চিত্রাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে "বেণুবাদিনী"র চিত্র। এ ছাড়া 'ষড়্দন্ত-জাতক' 'মহাকপি জাতক' 'বিশ্বান্তর জাতক' প্রভৃতি একাধিক জাতকের কাহিনীও এখানে চিত্রিত আছে। ১৭ নং গুহার যে চিত্র দুটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—সে দুটি হচ্ছে "মাতা ও পুত্র" এবং "ভগবান শ্রীবুদ্ধদেব"! এ গুহায় অঙ্কিত 'শরভ জাতক' 'মাতৃপোষক জাতক' 'শ্যামা জাতক' প্রভৃতি কাহিনীর চিত্রগুলিও চমৎকার। 'সিংহল অবদান' এ গুহার আর একটী উল্লেখযোগ্য ছবি। এই ছবিতে বিজয় সিংহের সিংহল-জয়ের কাহিনী চিত্রিত হ'য়েছে। "রাণীর প্রসাধন" এ গুহার আর একটি উল্লেখযোগ্য ছবি।

অজন্তা-চিত্রাবলীর অনুপম সৌন্দর্য্যের সম্যক্ বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলে আমি সে অসম্ভবের চেষ্টা থেকে বিরত হলুম।

অজন্তার ভাস্কর্য্য-শিল্পের বিশেষত্ব চোখে পড়ে ১নং, ৪নং, ৭নং, ১৬নং, ১৯নং, ২৩নং, ২৪নং ও ২৬নং এই আটটি গুহায়। ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য্যের জন্য সাঁচী, ভারুত, অমরাবতী প্রভৃতি স্থান আজ জগদ্বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। কিন্তু অজন্তা গুহাতেও যে ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য্যের

বহু নিদর্শন পাওয়া যায়, সে কথা আমি পূর্ব্বেই বলেছি! গুপ্তযুগে অর্থাৎ ৩২০-৪৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় ভাস্কর্য্য যে উন্নতির চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিল, সে পরিচয় অজন্তা গুহা দেখতে গেলেই দর্শকের মনে না উঠেই পারে না। এক নম্বর গুহার বারান্দার উপরের দিকে পাষাণ
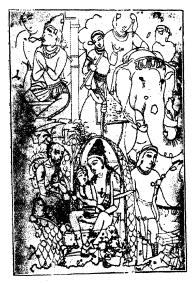
১৭ নং গুহার ভিত্তিগাত্রের চিত্র (বিশ্বান্তর জাতক)

ভেদ করে যে সচিত্র ঝালর উৎকীর্ণ করা আছে, যার মধ্যে এই মানব-জীবনের নানা বিচিত্র ঘটনা,—অরণ্য-যুগের জীবজন্তুর অবস্থা থেকে

১৭ নং গুহার একখানি প্রসিদ্ধ চিত্র

মাতা ও পুত্র

গেঁয়ো বর্ব্বর যুগের—শহর এবং রাজ-প্রাসাদের জীবন-যাত্রা পর্য্যন্ত অতি সুন্দর ভাবে খোদিত করা আছে—ভাস্কর্য্য-শিল্পীদের কাছে তা আজও বিস্ময়কর ব'লে মনে হয়!
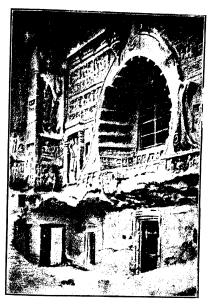
১৯ নং গুহার (চৈত্য) প্রবেশ-দ্বার-সম্মুখের কারুকার্য্য

৪নং গুহায় 'পদ্মপাণির' যে অপরূপ সুন্দর মূর্ত্তিটি পাহাড় কুঁদে বার করা হ'য়েছে, উন্নত ও শ্রেষ্ঠতম তক্ষণ-শিল্পের অমন সুষমা-মণ্ডিত সুচারু

নিদর্শন খুব অল্পই চোখে পড়ে! ৭নং গুহায় পাথরের বুকে পদ্মকলি ও প্রস্ফুট শতদলের যে অনবদ্য লীলা বিকশিত হ'য়ে উঠেছে, মানস-সরোবরে ইন্দিরার চরণকমলও বুঝি তত সুন্দর নয়। ১৬নং গুহায় নাগ দম্পতীর প্রতিমূর্ত্তি ভাস্কর্য্য-শিল্পের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন। ১৯নং গুহাটি যেন কেবল-মাত্র ভাস্কর্য্য-কলার পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যই সৃষ্টি করা হ'য়েছিল। এই গুহার চারিদিকেই ভাস্করের করধৃত লৌহফলক দুর্ভেদ্য পাষাণকেও যেন অবলীলায় ইচ্ছামতো শিল্পীর কল্পনার রূপ দিয়েছে। ২৪নং গুহার বারান্দার ধারক বাহু (Supporting Bracket) রূপে যে আকাশ-বিহা রিণীদের মূর্ত্তি আছে, তার সৌন্দর্য্যও অতুলনীয়। ২৬নং গুহাটিও ১৯নং গুহার মতই বিবিধ তক্ষণ-কলায় আপাদমস্তক মণ্ডিত। কিন্তু এ গুহার ভাস্কর্য্য-পদ্ধতি, ধরণ-ধারণ ও ভঙ্গী ১৯নং গুহার সঙ্গে একেবারেই মেলে না! এটী চৈত্য-গুহা। এর অভ্যন্তরস্থ মূর্ত্তি ও কারুকার্য্য সব যেন একটু বিরাট রকমের! 'বুদ্ধের নির্ব্বাণ' ও 'বুদ্ধের পরীক্ষা'—পাষাণে খোদিত এই ৬টী মূর্ত্তির শিল্প সর্ব্বাগ্রে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত বিশাল বুদ্ধ-মূর্ত্তিটি শায়িত অবস্থায় রয়েছে—গুহার বামদিকের সমগ্র দেওয়ালটি প্রায় জুড়ে! কিন্তু কি সুন্দর পরিমাপ-জ্ঞান ছিল সেই দ্বি-সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ভারতীয় শিল্পীদের—যে এই বিরাট প্রস্তর-পর্ব্বেও কোনোটিই কোথাও এতটুকু বেমানান ঠেকে না! এই শায়িত বিশাল বুদ্ধ-মূর্ত্তির তলদেশে শ্রীভগবান বুদ্ধের অসংখ্য শিষ্য-সেবক, ভিক্ষু, যতি, সন্ন্যাসী, গ্রামবাসী, রাজরাণী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর নর-নারীর একত্র অবস্থান এমন সুকৌশলে সন্নিবেশিত করা হ'য়েছে যে, এই ভাস্কর-শিল্পীর প্রতিভার উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন না ক'রে থাকা যায় না।

স্থাপত্য-কলার দিক দিয়ে পূর্ব্বোক্ত 'চৈত্য-গুহা' চারিটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া 'বিহার' গুহার মধ্যে ১নং ২নং ৪নং ৬নং ৭নং
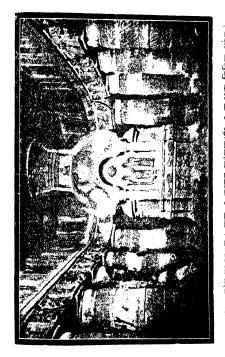
১৬ নং গুহার অভ্যন্তর (স্তম্ভ ও ছাদের কারুকার্য্য ও কুলুঙ্গির বিচিত্র গঠন)

১২নং ১৬নং ও ২০নং এই আটটি গুহাও দ্রষ্টব্য। ভারতীয় স্থাপত্য-কলার বিবর্ত্তন বহু যুগ ধ'রে সাধিত হ'য়েছে। দেশকালের পার্থক্য অনুসারে বিভিন্ন রাজাদের সময় ভিন্ন ভিন্ন যুগে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ও শিক্ষার প্রভাবে এ দেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-শিল্প এমন এক-একটা পৃথক রূপ, পৃথক ভঙ্গী ও পৃথক ধারা অবলম্বন ক'রে প্রকাশ পেয়েছে যে, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-
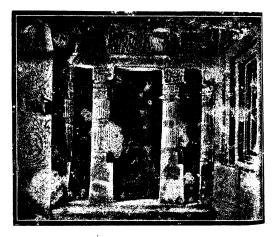
২৩ নং গুহার অপরূপ ভাস্কর্য্য-শিল্প

তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা, সেগুলি সহজে সনাক্ত করা যেতে পারবে ব'লে, বিভিন্ন নামে তার শ্রেণী বিভাগ করে দিয়েছেন ; যেমন 'জৈন' 'বৌদ্ধ' 'হিন্দু' বা 'ব্রাহ্মণ', 'যাবনিক' (Saracenic) আর্য্য-যাবনিক (Indo-Saracenic) 'মথুরা' 'গান্ধার' 'গুপ্ত' 'চালুক্য' প্রভৃতি। গুপ্ত-যুগের স্থাপত্য-শিল্প

নির্দ্দেশের জন্য কানিংহাম সাহেব যে ছয়টি লক্ষণ বা অভিজ্ঞানের উল্লেখ করে গেছেন, সেগুলি জানা থাকলে একজন আনাড়ীও অতি সহজেই গুপ্ত-যুগের স্থাপত্য-শিল্পকে সনাক্ত করতে পারবে! সে ছয়টি চিহ্ন হ'চ্ছে—
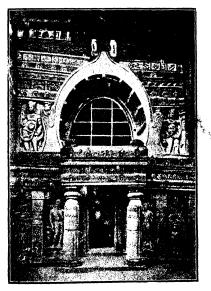
১৯ নং গুহার সম্মুখের অতুলনীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-কলা

প্রথম—চূড়াহীন সমতল ছাদ।

দ্বিতীয়—দরজা বা জানালার উপরকার ঝনকাঠ বা পাথরের দ্বারপিণ্ডী

উভয় পার্শ্বস্থ বাজু অতিক্রম করে দু'ধারেই খানিকটা ক'রে বেড়ে থাকা।

তৃতীয়—প্রবেশ-দ্বারের দুই দিকে গঙ্গা যমুনা প্রতিমূর্ত্তি খোদিত থাকা।

চতুর্থ—মূল গৃহটির চারিদিক বেষ্টন করা স্তম্ভ শ্রেণী ও তদুপরি মূল গৃহের ছাদের অপেক্ষা নিম্নতর ছাদ সন্নিবেশিত!

পঞ্চম—বিশাল চতুষ্কোণ শীর্ষযুক্ত স্তম্ভ ও তদুপরি বৃক্ষতলে অর্দ্ধাসীন সিংহদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত।

ষষ্ঠ—স্তম্ভ-শিরে গুল্-বসানো অলঙ্কারের অদ্ভুত পরিকল্পনা; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্শ্ব-শৃঙ্গ সংযুক্ত অসংখ্য মৌচাকের মতো!

প্রাক্-গুপ্তযুগের ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-কলার প্রধান লক্ষণই হচ্ছে, তার বিরাটত্ব। তা ছাড়া, তার সোপান-শ্রেণী, স্তম্ভ-শ্রেণী, ঘরের চৌকাঠ এবং উচ্চ ভিত্তিও লক্ষ্য করবার বিষয়। পাহাড় কেটে বা পাথর কুঁদে মূর্ত্তি ও গৃহ-নির্ম্মাণের চেষ্টা, নির্ভুল স্পষ্ট রেখাঙ্কন, সমতল-ক্ষেত্রে সুসম্পূর্ণ কাজ, সাধাসিধে ভঙ্গী, সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারের বাহুল্য-বর্জ্জিত, ফুলকাটা লতা-পাতার কাজ-শূন্য এবং বেশীরকম খুঁটি-নাটি দেখাবার চেষ্টাহীনতা।

ভারতীয় স্থাপত্য-কলার একটা নিজস্ব রূপ আছে যা ভারতেরই মৌলিক সম্পত্তি; কোনও দেশের কাছে তা ধার-করা নয়। গুপ্ত যুগ ও প্রাক্-গুপ্ত-যুগের স্থাপত্য-শিল্পের যে যে অভিজ্ঞানের কথা আগে বললুম, অজন্তার স্থাপত্য-কলায় এতদুভয় যুগেরই নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। শত শত বৎসর ধ'রে ভারতীয় স্থাপত্য-কলার যে ক্রমোন্নতি ও বিবর্ত্তন সাধিত হ'য়েছে, অজন্তার প্রত্যেক গুহাটি যেন তার ইতিহাস বক্ষে নিয়ে সযত্নে রক্ষা করছে!

অজন্তার চৈত্য ও বিহার-গুহার নির্ম্মাণ-পদ্ধতি ও গঠন-প্রণালী এবং তার কারুকার্য্য ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের গৌরব-কেতন-স্বরূপ। ৯নং চৈত্য-

গুহাটি অজন্তার মধ্যে স্থাপত্য-কলা হিসাবে সব চেয়ে প্রাচীন ব'লে স্থির হয়েছে। এ গুহাটি চতুষ্কোণ। স্তম্ভশ্রেণীর দ্বারা মধ্যভাগ ও পার্শ্বভাগ বিভক্ত। স্তম্ভগুলি অষ্টকোণ-বিশিষ্ট। শীর্ষদেশে ও মূলদেশে কোনও
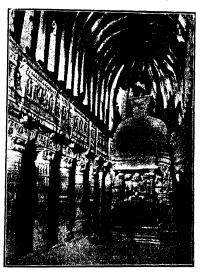
চৈত্য গুহার অভ্যন্তর ভাগ

'মুকুট' (Capital) বা 'আসন' (Base) নাই। চৈত্য-গুহার একটা প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে তার অভ্যন্তরস্থ বৌদ্ধ-স্তূপ ও বহির্ভাগের সম্মুখস্থ বিরাট অশ্বখুর-তুল্য তোরণাকৃতি বাতায়ন। এটি খুব উচ্চে গুহা-প্রবেশ-পথের উপর দিকে থাকে। এই পথেই গুহার মধ্যে আলোক প্রবেশ করে।

চৈত্য-গুহার মধ্যভাগের ছাদের অভ্যন্তর-দেশ অন্তঃবর্ত্তুলাকার বা গম্বুজ-গর্ভের মত খিলান করা। কিন্তু স্তম্ভ বিভক্ত পার্শ্ব-চতুষ্টয়ের ছাদের অভ্যন্তর-ভাগ সমতল। সে সময় কারুকার্য্য খচিত কাঠের কড়ি-বরগা ও জানালা-দরজার প্রচলন ছিল, জানা যায়। ১০নং গুহাটি ৯নং গুহার অপেক্ষা আকারে বড়, কিন্তু গঠন-প্রণালী একই প্রকার; কেবল স্তূপটি অন্য রকম। এ গুহার পার্শ্ব-চতুষ্টয়ের সমতল ছাদে পাথরের কড়ি-বরগা, কিন্তু মধ্যভাগের খিলান করা ছাদে কাঠের কড়ি-বরগা, দেখে মনে হয়, কাঠের বদলে পাথরের ব্যবহার এইখান থেকে সুরু হ'য়েছে। ১৯নং ও ২৬নং চৈত্য-গুহা-দুটি আবার অন্য প্রকারের। পূর্ব্বোক্ত চৈত্য-গুহা দুটি হীনযানী বৌদ্ধদের এবং এ দু'টি গুহা মহাযানী বৌদ্ধদের। এগুলি ঠিক চতুষ্কোণ নয়। ১৯নং গুহাটি বিশেষজ্ঞদের মতে বৌদ্ধ শিল্প নৈপুণ্যের একেবারে চরম নিদর্শন! এই গুহার প্রবেশ-পথেও কারুকার্য্য খচিত স্তম্ভ যুক্ত একটি গাড়ী-বারান্দা আছে। সম্মুখভাগ এবং ভিতর ও বাহির আগাগোড়াই সুচারু কারুকার্য্য-খোদিত। সমস্তই পাথর কেটে তৈরী, কাঠের সম্পর্ক নেই কোথাও। স্তম্ভগুলির 'আসন' চতুষ্কোণ, কিন্তু ঊর্দ্ধভাগ খানিকটা অষ্টকোণ, খানিকটা একেবারে গোল, খানিকটা বা স্ক্রুর মতো প্যাঁচকাটা। স্তম্ভের গায়ে মধ্যে মধ্যে কারুকার্য্য খচিত বন্ধনী বা বেষ্টনী আছে। শীর্ষদেশের 'মুকুটে' বুদ্ধমূর্ত্তি উৎকীর্ণ-করা এবং 'ধারক-বাহু' রূপে বিমানবিহারীদের আকৃতি পরিকল্পিত হ'য়েছে। মহাযানী চৈত্য-গুহার অভ্যন্তরস্থ বৌদ্ধ স্তূপটি আকারে, গঠনে ও শিল্প-পারিপাট্যে হীনযানীদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। হীনযানী স্তূপে কোনও মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা নেই; কিন্তু মহাযানী স্তূপে আমরা দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট বুদ্ধ-মূর্ত্তি ও কিন্নরগণের মূর্ত্তি খোদিত রয়েছে দেখতে পাই। মহা-যানী স্তূপের আর একটা প্রধান বিশেষত্ব দেখলুম—চূড়ার উপর পরের পর

তিনটি ছত্র কুণ্ডলাকার হ'য়ে উঠেছে ! হীনযানী-স্তূপ-শীর্ষে বিশেষত্ব-বর্জ্জিত কার্ণিশ !

২৬নং চৈত্য-গুহাটি সর্ব্বশেষ নির্ম্মিত হ'য়েছিল ব'লে বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন। এ গুহার নক্সা ও নির্ম্মাণ-পদ্ধতি ১৯নং গুহারই অনুরূপ, কেবল কারুকার্য্য ও অলঙ্কারের দিক থেকে অনেকটা দীন। এ গুহার প্রাচীর-গাত্রে ভাস্কর্য্য-শিল্প তা যেমনি আকারে বড় বড়, তেমনি তার মোটা মোটা কাজ। এর অভ্যন্তরস্থ স্তূপটির সম্মুখভাগ একেবারে মণ্ডপাকার।

এই অজন্তার চৈত্য-গুহাস্থ বৌদ্ধ-স্তূপের গম্বুজাকার শীর্ষদেশ থেকেই ক্রমে দক্ষিণের হিন্দু-মন্দিরের 'বিমান-শীর্ষ' বা গম্বুজাকার চূড়া ও মোগল আমলের 'ডোম' সৃষ্টি হ'য়েছে ব'লে হ্যাভেল প্রভৃতি বিশেষজ্ঞেরা সিদ্ধান্ত করেছেন। এবং চৈত্য-গুহার সম্মুখস্থ তোরণ-বাতায়নের সূচীশীর্ষ খিলান থেকেই মোগল-স্থাপত্যের ত্রিকোণ-খিলানের আদর্শ গৃহীত হয়েছে ব'লে তাঁরা অনুমান করেন।

'বিহার'-গুহাগুলির মধ্যে ১৩ নং গুহাটিই সবচেয়ে প্রাচীন বলে স্থির হ'য়েছে ! তবে গুহাটিতে স্থাপত্য-কলার দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনও বিশেষত্ব নেই বলা চলে। ১২নং গুহাটিও খুব প্রাচীন ; কিন্তু এর মধ্যে স্থাপত্য-শিল্পের প্রাথমিক নিদর্শন কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। ১১নং বিহার-গুহাতে যে স্তম্ভ আছে, বিশেষজ্ঞেরা বলেন এইগুলিই না কি সবচেয়ে প্রাচীন যুগের স্তম্ভ। ৭নং গুহার গঠন-প্রণালী অন্যান্য গুহাগুলি হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক। এটির মধ্যে প্রশস্ত 'হল' নেই। মন্দির-চত্বরের মতো এই গুহার সম্মুখে স্তম্ভযুক্ত দু'টি তোরণ-মণ্ডপ আছে। ৬নং গুহাটির বিশেষত্ব হচ্ছে, এটি দ্বিতল ! অজন্তায় এই একটিমাত্র দ্বিতল বিহার-গুহা দেখতে পাওয়া যায়। বিহার-গুহাগুলির মধ্যে ৪নংটিই সবচেয়ে বড় অর্থাৎ প্রশস্ত। কিন্তু, কলা-সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে খ্যাতিলাভ

করেছে ১নং গুহা। ২নং বিহার-গুহাটি সকল দিক দিয়েই প্রায় এক নম্বরেরই অনুরূপ; কেবল কারুকার্য্য ও স্থাপত্য শিল্পের দিক দিয়ে অনেক অংশে হীন।

১৬নং গুহাটি স্থাপত্য-কলা হিসাবে বিহার-গুহার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিহার-গুহার নক্সা থেকে আরম্ভ করে এর পরিমাপ, স্তম্ভ-সমাবেশ এবং ছত্রতলের পরিকল্পনা স্থাপত্য-শিল্পে চরম উন্নতির পরিচায়ক ব'লে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই গুহার স্তম্ভগুলি ভারি সুন্দর। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে আপাদমস্তক মণ্ডিত। তোরণ-দ্বারে ঐরাবত ও প্রবেশ-পথে নাগরাজ-এর শোভা বৃদ্ধি করেছে।

২০ নং বিহার-গুহাটিও স্থাপত্য-কলার দিক দিয়ে অতুলনীয় বলা চলে। এর সোপানশ্রেণী, বারান্দা, স্তম্ভমালা, দেহলা, তোরণ প্রভৃতির গঠন-পারিপাট্য বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

২৬ নং গুহাটি অসম্পূর্ণ। এর নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হয়নি। কেন হয়নি, তা জানতে পারিনি। ২৫ নং গুহাটি দেখে বোঝা যায় যে, কি ভাবে এই অজন্তায় স্থাপিত বিরাট বৌদ্ধ-কীর্ত্তি পুনরুদ্ধার করে লোক-লোচন-গোচর করা হয়েছে!

বিহার-গুহার প্রত্যেকটির মধ্যে একটি ক'রে বিরাট বুদ্ধ-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই বুদ্ধ মূর্ত্তিগুলির জন্য প্রত্যেক বিহার-গুহা-সংলগ্ন এক একটি গর্ভ-গুহা আছে। এগুলি ঠিক মাঝের প্রবেশ-দ্বারের ঋজু ঋজু বিপরীত দিকে

অজন্তা গুহার চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-শিল্পের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে ক্ষণে ক্ষণে আমরা বিস্ময়ে, পুলকে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিলুম! ভারতের অতীত গৌরবের এই বিপুল নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে গর্ব্বে অহঙ্কারে আমাদের বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠেছিল! আনন্দ-গদ্গদ কণ্ঠে আবৃত্তি করেছিলুম—

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরভূধরের ভিত্তি
শ্যাম-কম্বোজে 'ওঙ্কার ধাম'—মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি,
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিটপাল আর ধীমান,—যাদের নাম অবিনশ্বর,
আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় করে রেখেছে 'অজন্তায়'!"

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রূপসী অজন্তার মোহ কাটিয়ে যেন আর ফিরে আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না!

২৯ নং গুহা থেকে যখন আমরা ফিরছি, অর্থাৎ অজন্তার সর্ব্বশেষ গুহাটি দর্শন করে আসবার সময় যে পথে গেছলুম, সেই পথেই ফিরতে হ'লো ব'লে আবার সকল গুহাগুলিরই সামনে দিয়ে আসতে হ'লো। কাতরভাবে তাদের দিকে শেষ বারের মতো বিদায়-চাওয়া চাইতে চাইতে আবার সেই এক নম্বর গুহার প্রান্তে এসে পৌঁছলুম। সূর্য্য তখন প্রায় পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আমরা সকলেই কাতর। অজন্তার সেই ছোট রেস্তোঁরাতে ঢুকে আমরা চারজনে চা রুটি বিস্কুট ও ডিম খেয়ে একটু ধাতস্থ হলুম। রেস্তোঁরার মুসলমান মালিকটি খুব যত্ন করে আমাদের খাওয়ালেন এবং চারজনকে চারখিলি পানও সেজে দিলেন। এইবার অনেকটা সুস্থ হ'য়ে পার্ব্বত্য সোপানশ্রেণী পার হয়ে আমরা মোটরে ফিরে এলুম এবং আমাদের সঙ্গের কলা, রুটী ও মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহার করলুম। পরে বাঘোরা প্রস্রবিণীর জলে তৃষ্ণা নিবারণ ক'রে বেলা পাঁচটা নাগাদ আবার জালগাঁওয়ে ফিরে চললুম।

ইলোরা

গোধূলির ম্লান-রক্তিম ছায়া দিগন্ত-প্রান্তে ধীরে ধীরে যখন আসন্ন সন্ধ্যার আবির্ভাব সূচনা করছে, ঠিক সেই সময় আমরা জালগাঁওয়ে ফিরে এলুম !

সকালে আমাদের স্নান হয়নি এবং খাওয়া-দাওয়াটাও তেমন যুতসই হয়নি ব'লে ষ্টেশনের বাথরুমে বেশ করে স্নান করে নিয়ে, আমি আর গোরক্ষপুরের বঙ্কিমবাবু বেরুলুম শহরের দিকে সান্ধ্য-ভোজের ব্যবস্থা করতে। জলধরদা' আর দিবাকরবাবু ষ্টেশনেই রইলেন।

জালগাঁও শহরের মধ্যে যেটি সবচেয়ে ভালো দেশী হোটেল (বিলিতি হোটেলের নামগন্ধও সেখানে নেই) সেখানে গিয়ে কী সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, তার সন্ধান ক'রে দেখলুম—তৈরী যা আছে, তার মধ্যে মাংসের পোলাও ছাড়া আর কিছু আমাদের চলবেনা ! হোটেলের মালিকটিকে দেখতে গুণ্ডা গোছের হ'লেও মানুষটি বেশ ভালো। তিনি ব'ললেন— আপনারা কি খেতে চান বলুন, আমি তৈরী করিয়ে দিচ্ছি। এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগবেনা।

আমাদের রাত্রি দশটার গাড়ীতে জালগাঁও থেকে মানমাদ যাবার কথা; সেখান থেকে রাত্রি বারোটায় গাড়ী বদল করে আওরাঙ্গাবাদ পৌঁছবার কথা ভোর বেলা। আওরাঙ্গাবাদ থেকে আমরা মোটর নিয়ে 'ইলোরা গুহা' দেখতে যাবো স্থির করেছিলুম। সুতরাং যথেষ্ট সময় আছে দেখে, আমরা ওই মাংসের পোলাওর সঙ্গে চারজনের মতন কারি, মটন কোর্ম্মা, ডিমের মামলেট ও খান-কয়েক কোপ্তা তৈরী ক'রে দেবার

অর্ডার দিয়ে এক ঘণ্টা সময় কি ভাবে কাটানো যায় ভাবতে ভাবতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

খানিকদূর গিয়ে দেখি, সামনে এক 'সিনেমা হাউস'! কি ফিল্ম আজ দেখানো হবে খবর নিয়ে দেখতে যাবার আর উৎসাহ হ'লোনা। আরও খানিকদূর এগিয়ে দেখি, পথের পাশের একটি মাঠে হাট বসেছে। ফল-মূল, তরি-তরকারী, চাল-দাল, কাপড় জামা থেকে আরম্ভ ক'রে খেলনা, পুতুল ও মনিহারী জিনিসের অসংখ্য দোকান বসে গেছে। গীতবাদ্য ও রং-তামাসাও দেখানো হ'চ্ছে। অনেকটা 'মেলা'র মতো যেন! ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যাই বেশী এবং তাদের মধ্যে অনেকেই বেশ সুবেশা ও সুশ্রী! মেলার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক ঘণ্টা সময় সহজেই কাটিয়ে দেওয়া গেল। আমার সঙ্গী বঙ্কিমবাবু একটা সুন্দরী তরুণী পসারিণীর কাছ থেকে কিছু সওদা করবার প্রলোভন সংবরণ ক'রতে পারলেন না। অত্যন্ত অনাবশ্যক কিছু জিনিস তিনি কিনছেন দেখে আমি তাঁকে বন্ধুভাবে নিষেধ করলুম। কিন্তু, তিনি আমার নিষেধ শুনলেন না, বরং আমাকে নিতান্ত অরসিক ও অকবি ব'লে ভর্ৎসনা করলেন।

মেলার জিনিসপত্র প্রায় সমস্তই হয় জার্ম্মাণী নয় জাপানে প্রস্তুত সস্তার মেলো-মাল। কাজেই কিছু কেনবার প্রবৃত্তি হয়নি আমার। আমি শুধু পোলাওর সঙ্গে ব্যবহার করবার সুবিধা হবে ব'লে—গুটি কয়েক নেবু কিনে ফেললুম। এ নেবুগুলি না-পাতি না-কাগজী, দুইয়ের মাঝামাঝি এক-রকম।

মেলায় ঘোরা শেষ ক'রে বেরিয়ে আসছি—হঠাৎ পথের ধারে একটি লঙ্কাওয়ালী বেশ বড় বড় টক্‌টকে লাল কাঁচা লঙ্কা বিক্রয় করছে দেখা গেল! বঙ্কিমবাবু কিছু কাঁচা লঙ্কা না কিনে মেলা থেকে বেরুতে পারলেন

না! কারণ, লঙ্কাওয়ালার গালের রক্তিম আভার সঙ্গে তার ডালার টাট্‌কা-ভেঙে-আনা লঙ্কাগুলির লাল্‌চে রং যেন প্রতিযোগিতা করছিল!

হোটেলে আসতেই হোটেলওয়ালা অভিবাদন ক'রে জানালে খাবার প্রস্তুত। একটা বড় ট্রেতে খাবারগুলি সাজিয়ে নিয়ে হোটেলের একজন খান্‌সামার মাথায় চাপিয়ে ষ্টেশনে নিয়ে আসা গেল।

আসবার সময় একটি রাস্তার মোড়ে দেখলুম এক প্রকাণ্ড বটগাছ; তার তলদেশ বাঁধানো। সেই বটগাছ-সংলগ্ন একটি ছোটখাটো মন্দিরও রয়েছে। অনেকগুলি স্ত্রীলোক সেখানে জড় হয়ে ধূপ দীপ জ্বেলে সেই বটবৃক্ষের অর্চ্চনা করছে। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের সঙ্গেই একটি না একটি ছেলে মেয়ে রয়েছে। সন্ধান নিয়ে জানা গেল যে, সন্তানের কল্যাণের জন্য পুত্রবতী জননীরা এই বটের অর্চ্চনা করেন।

ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে আমরা একরাত্রির জন্য যে অস্থায়ী বাসা বেঁধেছিলুম, তারই মাঝখানের গোল টেবিলটির উপর খবরের কাগজকে টেবিল-ক্লথ ক'রে ঢেকে আমরা চারজনে সান্ধ্য-ভোজে বসে গেলুম।

জালগাঁওয়ের জল-হাওয়ার গুণেই হোক্, বা আমাদের সারাদিনের গুহা-পরিদর্শনজনিত ক্লান্তির জন্যই হোক, সকলেই বেশ ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে উঠেছিলুম। সূপকারদের রন্ধনের তারিফ ক'রতে ক'রতে পরম পরিতোষের সঙ্গে আমাদের সান্ধ্য-ভোজ শেষ করলুম। জিনিসপত্র সব গোছানোই ছিল। কেবল বটীবাটি, গেলাস, গামছা, তোয়ালে প্রভৃতি খুচরো জিনিসগুলো বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে গাড়ীর অপেক্ষায় ক'জনে নিয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর বেরিয়ে এসে অপেক্ষা ক'রতে লাগলুম।

শীতের রাত্রি যতই এগিয়ে আস্‌ছিল, পৌষের প্রখর ঠাণ্ডার হিমকর-স্পর্শ ততই আমরা অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করতে পারছিলুম। দিনের বেলা তেমন শীত-বোধ হয়নি।

অজন্তায় আমাদের গরম-জামা, ওভার-কোট সব খুলে আমরা মোটরে রেখে গেছলুম। দুপুরে বেশ একটু ঘেমেও উঠতে হ'য়েছিল। কিন্তু, এখন শুধু ওভার-কোট পরা নয়, তার কলার উল্টে গলার উপর তুলে দিয়ে এবং মাথার টুপী যথাসম্ভব টেনে কাণ ঢাকা দিতে হয়েছিল।

মানমাদের গাড়ী এসে পড়লো। আমরা ক'জনে একটা খালি কামরা দেখে উঠে পড়লুম। দাদার কাছ থেকে তাড়া খেয়ে জিনিষপত্রগুলো সব ঠিক উঠলো কি না, ভালো ক'রে দেখে মিলিয়ে নিতে হ'লো। ষ্টেশনে আমি এবার কিছু ফেলে এলুম কি না, তিনি বারবার সে খবরটুকু নিলেন; এবং সমস্ত জিনিস উঠেছে জেনে তবে নিশ্চিন্ত হলেন।

গাড়ী ছেড়ে দিলে। আমরা ভেবেছিলুম, রাত্রি বারোটায় যখন গাড়ী বদল ক'রতে হবে, তখন আর কেউ শোবোনা। এ সময়টুকু গাড়ীতে গল্প ক'রে কাটিয়ে দেবো। কিন্তু গাড়ীর কোলে ব'সে দোল খেতে খেতে আমাদের সকলেরই ক্লান্ত দেহ অবিলম্বে নিদ্রার কবলে চোখ বুঁজিয়ে আত্মসমর্পণ ক'রলে।

হঠাৎ 'মানমাদ!' 'মানমাদ!' কাণে আসতেই ঘুম ভেঙে গেল! ধড়মড়িয়ে সবাই উঠে পড়লুম! 'কুলি!' 'কুলি!' বলে সমস্বরে ক'জনে চীৎকার করতে লাগলুম;—কিন্তু তাদের আসা পর্যান্ত অপেক্ষা করতে পারলুমনা। নিজেরাই ব্যস্ত হ'য়ে সমস্ত মালপত্র ধরাধরি ক'রে গাড়ী থেকে নামিয়ে ফেললুম।

ইতিমধ্যে কুলিরা এসে পড়লো। আওরাঙ্গাবাদের গাড়ীতে আমাদের জিনিস সব তুলে দিতে ব'লে আমরা নিশীথ রাত্রের তীব্র শীতে কাঁপতে কাঁপতে চায়ের দোকানে গিয়ে হাজির হলুম। গরম চা' দু' এক কাপ খেয়ে ধাতস্থ হ'য়ে আমরা গাড়ী বদল করলুম।

আবার সেই মালের সতর্ক হিসাব নেওয়া হ'লো। সব ঠিক্ উঠেছে দেখে, সে রাত্রের মতো নিশ্চিন্ত হ'য়ে শোয়া গেল।

ভোর ছ'টায় আওরাঙ্গাবাদে এসে নামলুম। শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন অস্পষ্ট উষা। তখনও প্রভাতের আলো ভালো ক'রে ফোটেনি। ভোরের কনকনে ঠাণ্ডা উত্তুরে বাতাস আমাদের গায়ের সমস্ত গরম কাপড়কে তুচ্ছ ক'রে একেবারে হাড়ের সঙ্গে পরিচয় করে নিতে লাগলো। সে পরিচয়ের নিবিড় আবেগে আমাদের আপাদ-মস্তক ক্ষণে-ক্ষণে থর-বিকম্পিত হ'য়ে উঠছিল!

মালপত্র সব প্ল্যাটফর্মের উপর ফেলে রেখে চা-ওয়ালার শরণাগত হওয়া গেল। তাকে তাড়া দিয়ে খুব খানিকটা চা তৈরী করিয়ে নিয়ে ক'জনে একাধিক পেয়ালা পান করে মোটর-গাড়ীর দর ক'রতে লেগে যাওয়া গেল।

আওরাঙ্গাবাদ ষ্টেশন থেকে ইলোরা গুহার দূরত্ব মোটে চৌদ্দ মাইল। মোটরবাস্‌ওয়ালারা একটাকা ক'রে মাথা পিছু নিয়ে আমাদের পৌঁছে দিতে চাইলে। কিন্তু, আমাদের মতলব ছিল অন্য রকম। সময় আমাদের হাতে অত্যন্ত কম। ৮ই জানুয়ারীর মধ্যে জলধরদাদাকে কলকাতায় ফিরতেই হবে, নইলে "ভারতবর্ষ" বেরুতে দেরী হ'তে পারে। বঙ্কিমবাবু ও দিবাকরবাবু ব'ললেন—৭ই জানুয়ারী গোরক্ষপুরে ফিরতে না পারলে তাঁদের 'বেকার' অবস্থায় একেবারে এখান থেকেই দেশে ফিরে যেতে হবে! আর কর্ম্মস্থলে মুখ দেখানো চলবে না! আমার ছুটি যদিও ২১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ছিল, তবু ৬ই জানুয়ারীর মধ্যে ইলোরা, নাসিক্, বোম্বাই, পুণা ঘুরে কলকাতায় ফিরতে গেলে যে রকম বিদ্যুৎ-গতিতে ভ্রাম্যমান হওয়া দরকার, অগত্যা সেইরূপ ব্যবস্থাই ক'রতে হ'লো।

চারজনে পরামর্শ ক'রে স্থির করলুম যে, আজকে তারিখ হ'লো তরা জানুয়ারী। আজ ইলোরা দেখে আওরাঙ্গাবাদে ফিরে এসে যদি আবার মানমাদ হ'য়ে বোম্বাই যাওয়া হয়, তাহ'লে ৫ই তারিখের আগে নাসিক দেখে বোম্বাই পৌঁছাতে পারবো না; এক দিন ও এক রাত্রি অকারণ বিলম্ব হ'য়ে যাবে; কিন্তু আওরাঙ্গাবাদে আর না ফিরে যদি সকালের দিকেই ইলোরা দেখা শেষ ক'রে একেবারে চাল্লিশগাওয়ে গিয়ে বেলা একটার ট্রেণ ধ'রতে পারি, তাহ'লে আজই চারটে নাগাদ আমরা 'নাসিক' গিয়ে পৌঁছতে পারবো। বিকেলটায় নাসিক পরিদর্শন শেষ ক'রে আবার আজই রাত্রি দশটার গাড়ীতে বোম্বাই রওনা হওয়া যাবে। তাহ'লে চৌঠা জানুয়ারী ভোরে বোম্বাই পৌঁছুতে পারবো। চৌঠা থেকে ৬ই পর্য্যন্ত তিন দিন বোম্বায়ে থাকা যাবে। তারই মধ্যে একদিন গিয়ে পুণা ও বেড়িয়ে আসা হবে; তারপর ৬ই রাত্রের গাড়ীতে বোম্বাই ছেড়ে যে যার ঘরমুখো হবো।

যে কথা সেই কাজ! এই ভাবে গেলে একটা দিন পূরো যখন হাতে পাওয়া যাবে, তখন আর এতে অমত কি থাকতে পারে? আমরা তাই আর মোটরবাসে ইলোরা না গিয়ে একখানি 'সপ্তাসন' (Seven Seater) ডজ্ গাড়ী চল্লিশ টাকায় ঠিক ক'রে ফেললুম। সে আমাদের আওরাঙ্গাবাদ থেকে ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী 'ইলোরা গুহা' দেখাতে নিয়ে যাবে। আবার পথে দাঁড় করিয়ে দৌলতাবাদের প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য দুর্গটি দেখবার সুযোগ দেবে। তার পর আমরা যদি বেলা ১০টার মধ্যে 'ইলোরা' দেখা শেষ ক'রতে পারি, তাহ'লে সে নিশ্চিত আমাদের ৫৬ মাইল দূরে চাল্লিশগাওয়ে নিয়ে গিয়ে বেলা একটার ট্রেণ ধরিয়ে দিতে পারবে। 'দুর্গা' ব'লে মালপত্র সব মোটরের মধ্যে কতক এবং কতক ফুটবোর্ড ও মাড্‌গার্ডের উপর তুলে বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে 'ইলোরা' যাত্রা করলুম। তখনও সাতটা বাজেনি।

বেলা আটটার মধ্যেই ইলোরা গুহার সম্মুখে এসে নামলুম আমরা। এখানে মোটর প্রায় পাহাড়ের গুহার দ্বার পর্য্যন্ত আসতে পারে, এমন ভাবে ঢালু রাস্তা তৈরী করা হ'য়েছে।

পথে আমরা দৌলতাবাদের পার্ব্বত্য-দুর্গটি দেখে আসতে ভুলিনি। আওরাঙ্গাবাদ থেকে দৌলতাবাদ মাত্র ৮ মাইল দূরে। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তিনি এই আওরাঙ্গাবাদ শহরটি প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন এবং নিজের নামেই এর নামকরণ ক'রেছিলেন—আওরাঙ্গাবাদ। আওরাঙ্গাবাদ শহরটির সর্ব্বাঙ্গে এখনও সেই প্রাচীন মোগল নগরীর বিশেষত্বের ছাপ সুস্পষ্ট লেগে রয়েছে দেখা গেল। এতকালেও যে এ শহরটির খুব বেশী কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। প্রাচীন মোগল শহর—সেই ডোম, মীনার, মসজেদ, ত্রিকোণ খিলান, স্তম্ভ-তোরণ, নহবৎখানা মুশাফেরমহল—বেশ লাগছিল তার মধ্যে দিয়ে যেতে। ছোট্ট শহর। শীঘ্রই আমরা নগর-প্রাকারের তোরণ-দ্বার পার হ'য়ে তার পার্ব্বত্য উপকণ্ঠে এসে পড়লুম।

অনেকদূর থেকেই দৌলতাবাদের পার্ব্বত্য-দুর্গের গগনস্পর্শী চূড়া দেখা যাচ্ছিল। আমরা দৌলতাবাদে পৌঁছে দেখলুম শহরটি ধ্বংস হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে শুধু ওই দুর্ভেদ্য পাষাণ-কেল্লা! একটি উঁচু পাহাড়ের একেবারে চূড়োর উপর এই কেল্লাটি তৈরী হ'য়েছিল। পাহাড়টি সোজা উপরে উঠে গেছে ব'লে এটিতে চড়া একটু দুরারোহ ব্যাপার ব'লেই মনে হ'লো। ওঠবার চেষ্টাও কেউ করলুম না, কারণ আমাদের একান্ত সময়াভাব। নইলে, ইলোরা যাবার পথে এই আওরাঙ্গাবাদ, দৌলতাবাদ ও খুলদাবাদ এই তিনটি যায়গাতেই অনেক কিছু দেখবার ছিল। আওরাঙ্গাবাদ শহর থেকে তিন মাইল দূরে যে

গিরি-গুহা আছে, ৬৫০ খৃঃ অব্দে বৌদ্ধ ভক্তদের দ্বারা সেটি নির্ম্মিত হ'য়েছিল। বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য-শিল্পের যে অপূর্ব্ব নিদর্শন এই আওরাঙ্গাবাদের গুহায় এখনও দেখতে পাওয়া যায় তা' অন্যত্র দুর্লভ! কিন্তু, কোনও উপায় ছিল না সে সব দেখে যাবার, আমাদের অবকাশের আয়ু তখন প্রায় নিঃশেষ হ'য়ে এসেছে। তাই, ভগবদ্দর্শনাভিলাষী সাধক যেমন সংসারের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের মায়া ত্যাগ ক'রে ছুটে যায় তার পরম প্রেয়র সন্ধানে, তেমনি ক'রে আমরা পথের ধারে ধারে ছড়ানো ছোট-খাটো বিস্ময়ের সামগ্রীগুলিকে বেদনার সঙ্গে বর্জ্জন ক'রে ছুটে চ'ললুম একেবারে সেই বিশ্বের বিরাট বিস্ময়ের বস্তু 'কৈলাস' দেখতে!

ইলোরার প্রধান দ্রষ্টব্য এই কৈলাস মন্দির। অবনীর অষ্টম আশ্চর্য্যের চেয়েও অধিকতর অদ্ভুত মানবের এই বিস্ময়কর কীর্ত্তি! বিশাল পর্ব্বতের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে এই বিরাট মন্দির সৃষ্ট হ'য়েছে। এই শিব-নিকেতনের বিপুল আয়তন এবং এর অসামান্য স্থাপত্য-কৌশল ও ভাস্কর্য্য নৈপুণ্য দেখে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হ'য়ে ভাবতে হয়—এও কি সম্ভব? মানুষে কি কখনো এ জিনিস গড়তে পারে? এ নিশ্চয়ই সেই বিশ্ব-কর্ম্মার কাজ!—

আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে, অর্থাৎ ভারতে বৌদ্ধ-কীর্ত্তির অব্যবহিত অস্ত-বেলায় এবং ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের পুনরভ্যুদয়ের প্রথম প্রভাতে এই কৈলাসের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হ'য়েছিল। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এই মন্দির সমাপ্ত হ'তে সম্ভবতঃ শত বৎসরেরও অধিক কাল লেগেছিল। কারণ, এই মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রায় তিরিশ লক্ষ বর্গ ফিট পরিমাণ পাথর তাদের কাটতে হ'য়েছিল। পাহাড়ের বুকের কঠিন পাষাণস্তর ছেদ ক'রে সেকালের অদ্ভুতকর্ম্মা শিল্পীরা ২৭৬ ফিট লম্বা ও ২৫৪ ফিট চওড়া একটি প্রকাণ্ড গহ্বর খনন ক'রেছিল। মধ্যে ১০৭ ফিট উঁচু

একটি স্তূপ ছেড়ে রেখেছিল। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এই বিশাল গহ্বরের গভীরতাও ১০৭ ফিট। এই যে বিরাট পাষাণ-স্তূপটিকে তারা গহ্বরের মধ্যস্থলে অক্ষত রেখেছিল, এইটিকেই তারা পরে একটি অভ্রংলিহ দ্বিতল মন্দিরে রূপান্তরিত ক'রে নিয়েছিল। আমরা তাজমহল দেখে অবাক্ হ'য়ে যাই! কিন্তু এই গিরি-দেউল কৈলাসের অসামান্য পরিকল্পনা ও কারুকার্য্যের কাছে বিশ্ব-বিশ্রুত তাজমহলও যেন নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়ে!

কৈলাস মন্দিরের বহিঃ-প্রাচীরে বৃহদাকার ঐরাবত, সিংহ, গরুড় প্রভৃতি যে সব অতিকায় জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করা আছে, আজ তাদের অধিকাংশই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেছে। কিন্তু সেদিন বোধ হয় তাদের অস্তিত্ব বজায় ছিল। মন্দিরের গাত্রে দেখতে পাওয়া যায়, তারা কেউ চরে বেড়াচ্ছে, কেউ যুদ্ধ ক'রছে, কেউ শত্রুকে পদদলিত ক'রছে! ভিত্তিভূমির তল-পত্তনের উপর প্রশস্ত দালান, সুদৃশ্য চতুষ্কোণ স্তম্ভরাজি, দ্বারমণ্ডপ, পুণপীঠ, আসন-বেদী প্রভৃতি, সে যুগের ভাস্কর শিল্পীদের অসাধারণ কলা-কৌশল ও রূপ-দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। তারা যেন চেয়েছিল এমন একটি দেবমন্দির গ'ড়ে তুলতে—ভূ-ভারতে যার তুলনা মিলবে না! তাদের এ উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হ'য়েছিল, সে বিষয়ে আর কোনো মতদ্বৈধ থাকতে পারেনা।

মন্দির-গাত্রে মহাভারত ও রামায়ণের যে সব কাহিনী পাষাণ-চিত্রে উৎকীর্ণ করা আছে, তা দেখে অনেকে এই কৈলাসের নাম রেখেছেন 'গিরিকাব্য' (Rock Poem)। মন্দিরটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৬৪ ফিট লম্বা এবং উত্তর-দক্ষিণে ১০৯ ফিট লম্বা। মন্দিরের চারিদিকেই চারিটি ৪৫ ফিট উঁচু ধ্বজস্তম্ভ আছে। মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালে যে মূর্ত্তি-চিত্রটি উৎকীর্ণ করা আছে, সেটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। লঙ্কেশ্বর রাবণ

মন্দির-গাত্রে খোদিত রামায়ণের চিত্র
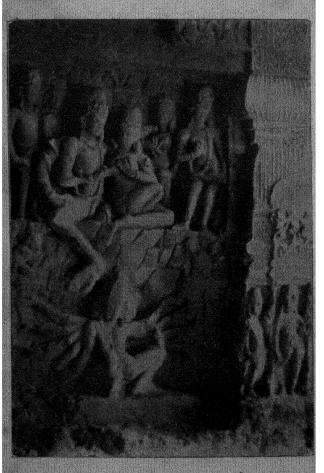
রাবণের কৈলাস উৎপাটন প্রয়াস
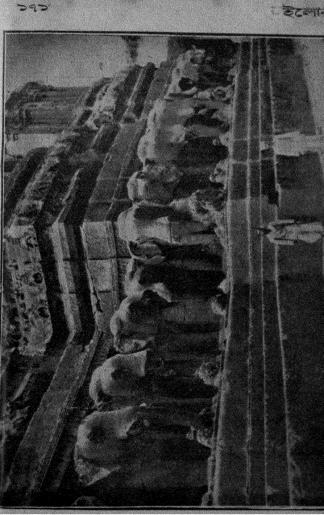
স্বয়ং বাহুবলে কৈলাস পর্ব্বতটীকে সমূলে উৎপাটনের চেষ্টা ক'রেছেন। কৈলাস-শৃঙ্গে হরপার্ব্বতী ব'সেছিলেন। পার্ব্বতী সভয়ে যেন পতিকে জড়িয়ে ধ'রেছেন। একজন পরিচারিকা প্রাণভয়ে পলায়ন ক'রছে।

মন্দিরের ভিত্তিমূলে বেদী-গাত্রে যে সব হাতীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা আছে, সেগুলি আকারে ও ভঙ্গিতে অবিকল জীবন্ত হাতীর মতো! মন্দির-প্রাঙ্গণটি পরিবেষ্টন ক'রে চারিদিকে একটি প্রশস্ত বারান্দা ঘুরে গেছে। এই বারান্দাটি আবার কোথাও দ্বিতল—কোথাও ত্রিতল। এই বারান্দার দেওয়ালের গায়ে সারি সারি নানা দেবদেবীর অসংখ্য মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা আছে। ভাস্কর্য্য-শিল্পের দিক থেকে বিচিত্রতা ও সুসম্পূর্ণতা হিসাবে এগুলির অসাধারণ বিশেষত্ব আছে। বাঘেশ্বরী, কালী, কাল-ভৈরব, নিয়তি, মহাকাল প্রভৃতির মূর্ত্তিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দেখলে কষ্ট হয় যে, এমন মূঢ় বর্ব্বরের দলও তখন পৃথিবীতে ছিল, যারা জগতের এমন অদ্বিতীয় ভাস্কর্য্য-শিল্প ও কলা-নৈপুণ্যের অপূর্ব্ব নিদর্শনকেও ধ্বংস ক'রে ফেলতে চেষ্টা ক'রেছিল—তাদের পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণুতার দোহাই দিয়ে! শুধু কি ভাস্কর্য্য? এই কৈলাস-মন্দিরাভ্যন্তরও আগাগোড়া অজন্তার মতোই বহুবর্ণে চিত্র-বিচিত্র করা ছিল; তার ক্ষীণ চিহ্নাবশেষ আজও একেবারে লুপ্ত হয়নি,—কিন্তু বিধর্ম্মীরা নির্ব্বিকার হ'য়ে সে শোভাও নষ্ট ক'রে দিতে পেরেছিল!

মাত্র একহাজার বৎসর আগেও এই কৈলাস ছিল ভারতের এক মহা-তীর্থভূমি। দেশ-দেশান্তর থেকে অসংখ্য তীর্থযাত্রীরা আসতো শিবের পূজা দিতে এখানে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম যে 'গ্রীষ্মেশ্বর'—সে যুগে এখানে তাঁরই বিগ্রহ ছিল। এখন তিনি ইলোরা গাঁয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। বর্ত্তমানে এ সবই নিজাম-রাজ্যভুক্ত হ'য়েছে। এ মন্দিরও দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত হ'য়ে মাটিচাপা ছিল। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ একে নূতন

করে আবিষ্কার করেছে। নিজাম সরকার একে এখন তাঁদের সযত্ন তত্ত্বাবধানে রেখেছেন।

দাক্ষিণাত্যের দিগ্বিজয়ী সম্রাট দন্তীদুর্গ অষ্টম শতাব্দীতে এই কৈলাস-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন ব'লে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন। এখানে পাশাপাশি বৌদ্ধ ও জৈন গুহাও আছে অনেকগুলি। সুতরাং ইলোরার প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে—এখানে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও জৈন এই ত্রিবিধ শিল্প-ধারার ত্রিবেণী-সঙ্গম দেখতে পাওয়া যায়। পর্ব্বত-গাত্রে সারি-সারি এই গুহাগুলি প্রায় কিঞ্চিদধিক এক মাইল স্থান জুড়ে আছে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে। বৌদ্ধ গুহাগুলিই সবচেয়ে প্রাচীন ব'লে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অভিমত দিয়েছেন। অজন্তা-গুহার সঙ্গে ইলোরার এই বৌদ্ধগুহাগুলির এত বেশী সৌসাদৃশ্য আছে যে, এ-গুলির আর নূতন করে বর্ননা করা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষত্বের মধ্যে এখানে একটি ত্রিতল বৌদ্ধগুহা দেখা গেল, এবং চিত্র অপেক্ষা ভাস্কর্য্যের প্রাধান্যই এখানে বেশী! ইলোরার এই পর্ব্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সারি-সারি বৌদ্ধগুহা দেখতে পাওয়া যায় এবং উত্তরাংশে জৈন-মন্দির-শ্রেণী। এগুলি 'ইন্দ্রসভা' নামে খ্যাত। এই বৌদ্ধ ও জৈন গুহাগুলির ঠিক মধ্যভাগে সারি-সারি প্রায় ১৫।১৬টি ব্রাহ্মণ্য-গুহা। ব্রাহ্মণ্য স্থাপত্য ও শিল্প-কলার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্যই যেন এই বিরাট মন্দির কৈলাস সে-গুলির মধ্যে সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এটিকে কিন্তু আর গুহা বলা চলবেনা। ব্রাহ্মণ্য-যুগের প্রভাবে প্রস্তুত এখানে প্রায় ১৫।১৬টি গুহা আছে বটে, কিন্তু সেগুলি সমস্তই প্রায় বৌদ্ধ-গুহার অনুকরণে নির্ম্মিত! কেবলমাত্র এই কৈলাস মন্দির গুহার মধ্যে থেকেও গুহার অবগুণ্ঠন খুলে ফেলেছে এবং বৌদ্ধ-প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে ফেলতে পেরেছে!

কৈলাসের মন্দিরে প্রবেশ করবার সময় আমরা বুঝতে পারিনি কিন্তু,

ইলোরা—বৌদ্ধগুহা
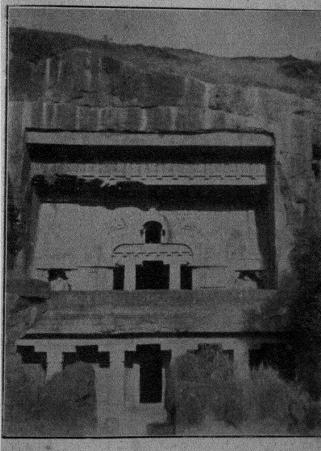
যে এটি গুহা নয়! কারণ, গুহার প্রবেশ-দ্বারের মতোই কৈলাসের তোরণ-দ্বারও পর্ব্বত-গাত্র ভেদ করে নির্ম্মিত হ'য়েছে। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করেই আমরা বিস্মিত হ'য়ে গেলুম। তোরণ-দ্বার পার হবার পরই মাথার উপর আর পর্ব্বতের চিহ্নমাত্র নেই! আকাশ দেখা যাচ্ছে।

প্রবেশ-দ্বারের বাইরের দিকে দশ অবতারের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রয়েছে! ভিতর দিকে উভয় পার্শ্বে পর্ব্বত-খোদিত কক্ষ বা বাসগৃহ দেখা গেল। তার পরই সম্মুখে প্রকাণ্ড এক 'কমলা'র মূর্ত্তি। পদ্মাসনা লক্ষ্মীর শিরে গজযূথ শুণ্ডের দ্বারা বারি বর্ষণ করছে।

মন্দির-প্রাঙ্গণের দক্ষিণে ও বামে দুটি বিপুলকায় ঐরাবত দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যে একটির অত্যন্ত ভগ্নদশা দেখে দুঃখ হ'লো। প্রাঙ্গণের সম্মুখে সুবৃহৎ নন্দীপীঠ। এটি দ্বিতল এবং মন্দির ও তোরণ-শীর্ষের সঙ্গে সেতু দ্বারা সংযুক্ত। এই নন্দীপীঠের উভয় পার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত চতুষ্কোণ ধ্বজস্তম্ভ আছে।

নন্দীপীঠকে মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রেছে যে সেতু, তার নিম্নে পরস্পর বিপরীত দিকে শিবের দুটি বড় বড় মূর্ত্তি আছে! একটি তাঁর কালভৈরব মূর্ত্তি, অপরটি মহাযোগীরূপে ধ্যানী মহেশ্বর!

এই সেতুর উভয় পার্শ্ব দিয়ে মন্দিরের দ্বিতলে উঠবার সোপান-শ্রেণী। এই দুই সোপানের প্রাচীর-গাত্রেই একটিতে আছে রামায়ণের কাহিনী উৎকীর্ণ করা, অন্যটিতে আছে মহাভারতের কাহিনী উৎকীর্ণ করা।

দ্বিতলের উপর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ-পথের দুই পার্শ্বে দুই শৈব দ্বারপাল গদা স্কন্ধে দণ্ডায়মান। ভিতরে একটি প্রশস্ত দালান, ৭৫ ফিট চওড়া ও ৫৪ ফিট লম্বা। এই দালানের মধ্যে বড় বড় চৌকো থাম উঠেছে ষোলটি। এই ষোলটি থাম মন্দিরের ছাদটি ধারণ করে আছে। এই দালানের পূর্ব্বপ্রান্তে গর্ভমন্দির ও বিগ্রহ-গৃহ। বিগ্রহ-গৃহ-দ্বারের
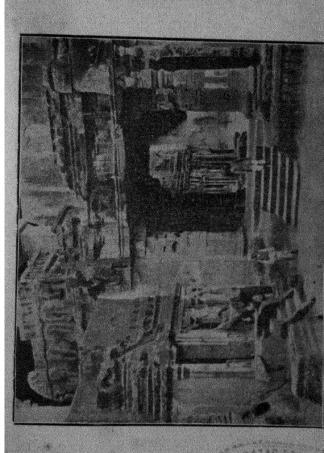
উপরে দাঁড়িয়ে পার্ব্বতী। তাঁর উভয় পার্শ্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দেব ও গন্ধর্ব্ববৃন্দ। গর্ভ-মন্দিরের উত্তর দিকের প্রাচীর-গাত্রে হরপার্ব্বতী অক্ষ-ক্রীড়া ক'রছেন—উৎকীর্ণ ছিল; এখান প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। দক্ষিণের প্রাচীর-গাত্রে শিবদুর্গা বৃষভারোহণে যাচ্ছেন। শিবের কোলে কুমার; সঙ্গে প্রমথবৃন্দ!

বিগ্রহ-গৃহদ্বারে উভয় পার্শ্বে দ্বারপালের পরিবর্ত্তে মকর-পৃষ্ঠে গঙ্গা ও কূর্ম্ম-পৃষ্ঠে যমুনা দাঁড়িয়ে! বর্ত্তমানে উভয়েরই মুখ দুটি ভেঙ্গে গেছে। বিগ্রহ-গৃহ চতুর্দ্দিকে ১৫ ফিট ক'রে দীর্ঘ একটি সাধারণ চতুষ্কোণ কক্ষ। ছত্রতলে একটি শুধু বড় গোপালের মতো শতদল ফুল। এর মধ্যে কী যে বিগ্রহ ছিল, শিবের মূর্ত্তি না লিঙ্গ, তা আজ জানবার উপায় নেই, কারণ বিধর্ম্মীরা অনুগ্রহ ক'রে তাকে অনেক আগেই ধ্বংস করেছিলেন। অনুমানে লিঙ্গ ছিল ব'লে মনে হয়। কারণ এই কৈলাসকে কেউ কেউ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ব'লে উল্লেখ করে গেছেন। তা ছাড়া, রাঠোর রাজাদের সৌভাগ্যের যুগে মধ্যভারতে লিঙ্গায়েৎ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রভাবই খুব বেশী রকম চোখে পড়ে।

দ্বিতলের উপর প্রধান মন্দিরের চারিদিক পরিক্রমণ করবার মতো ছাদ আছে। এই ছাদের ধারে ধারে ঘিরে আরও পাঁচটি ছোট ছোট মন্দির আছে। এই পঞ্চ ক্ষুদ্র মন্দিরে যে কোন্ পঞ্চ-দেবতা অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা' আর জানবার উপায় নেই!

মন্দির থেকে বেরিয়ে সেতুর উপর দিয়ে আমরা নন্দীপীঠে গেলুম। নন্দী-মণ্ডপের মধ্যে দেখি একটি ছোট্ট পাথরের বৃষ রয়েছে! বেশ বোঝা যায়, এটি অন্য কোনও স্থান থেকে সংগ্রহ ক'রে এনে এখানে রাখা হ'য়েছে। আসল বৃষটি স্থানচ্যুত হ'য়েছে। এটি একটি জাল-নন্দী!

কৈলাসের মন্দির থেকে নেমে আমরা আবার প্রাঙ্গণে এসে পড়লুম।
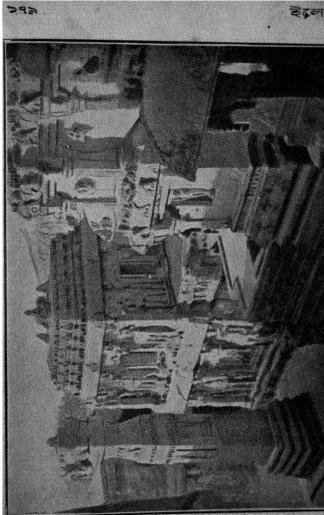
প্রাঙ্গণে পার হ'য়ে দক্ষিণের বারান্দার উপর দিয়ে ভাঙ্গা সিঁড়ি অতি কষ্টে বে'য়ে আমরা যজ্ঞশালায় গিয়ে উঠলুম। এটি ৩৭ ফিট লম্বা ও পনেরো ফিট চওড়া। যজ্ঞশালার সামনে দুটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ আছে। স্তম্ভ-গাত্রে দুটি এলোকেশী বামার মূর্ত্তি আছে। সঙ্গে তাদের বামন অনুচর। ভিতর দিকে দুটি থামের পিছনে দুটি বেদী আছে। তিন দিকে দেওয়াল। দেওয়ালের ধারে ধারে বড় বড় সব মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা রয়েছে। প্রথমেই বাঘেশ্বরী মূর্ত্তি। চার হাত, হাতে ত্রিশূল, পদতলে ভীষণ এক ব্যাঘ্র! দ্বিতীয় মূর্ত্তিও প্রায় ওই একই রকম। তৃতীয় মূর্ত্তি কাল বা নিয়তি! এক ভয়াল কঙ্কাল মূর্ত্তি, কটিতে ভুজঙ্গ-মেখলা ও কণ্ঠে ফণী-হার! শবাসনে সমাসীনা! পার্শ্বে এক হিংস্র ব্যাঘ্র একটি শবের পা চিবিয়ে খাচ্ছে! তার পরই কালীমূর্ত্তি, সঙ্গে ডাকিনী! পিছনের দেওয়ালে গণপতি! একটী স্ত্রীলোক এক শিশুকে নিয়ে শার্দ্দূল-পৃষ্ঠে; বসে আছেন ইন্দ্রাণী, পার্ব্বতী ও নন্দী, লক্ষ্মী ও গড়ুর! কার্ত্তিকেয় ও তাঁর সঙ্গে বাহন ময়ূর চঞ্চুপুটে একটি সর্প ধরে আছে। ত্রিশূল-হস্তে চতুর্ভুজা বৃষবাহনা আর এক দেবী, এবং সরস্বতী মূর্ত্তি। পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে আরও তিনটি দেবীমূর্ত্তি, ও একটি স্থূলকায় বামনের মূর্ত্তি। কেউ কেউ বলেন ওঁরা শিবকালী, ভদ্রকালী ও মহাকালী। এই তিন মহাকালীর রূপ। পাহাড় কেটে প্রমাণ আকারের এই বড় বড় মূর্ত্তিগুলি পাশাপাশি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ভাস্কর্য্য-শিল্পের যেন চরম নিদর্শন! মূর্ত্তিগুলি দেওয়ালের ধারে ধারে কুঁদে বার করা হয়েছে বটে, কিন্তু দেওয়ালের সঙ্গে লেগে নেই কোনটি। কৈলাস মন্দিরের এই যজ্ঞশালার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে আমরা ভাবতে লাগলুম—কী অসাধারণ প্রতিভা ও কলা-নৈপুণ্য নিয়েই না এই অদ্বিতীয় ভাস্কর ভূমিষ্ঠ হ'য়েছিলেন! কী বিরাট তাঁর কল্পনা! কী মহান্ তাঁর
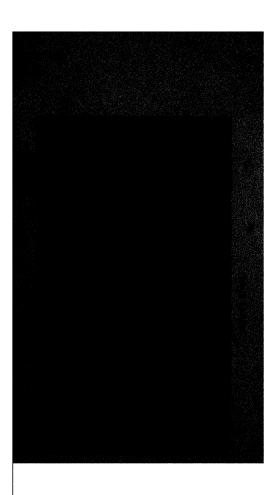
ধ্যান!—আর কী অসীম দক্ষতার সঙ্গেই না এই পাহাড়ের বক্ষ ভেদ ক'রে তিনি তাঁর অনুপম ভাবনাকে এ হেন অপরূপ রূপ দিয়ে গেছেন!

প্রাঙ্গণের উত্তর দিকের বারান্দা ঘুরে আর একটি সোপান অতিক্রম ক'রে আমরা এবার যেখানে এসে পৌছলুন—এটিকে বলে লঙ্কা বা লঙ্কেশ্বর। এরও প্রবেশ-পথের সম্মুখেই কমলার মূর্ত্তি রয়েছে দেখলুম। উপরের ঘরটি ১২৩ ফিট লম্বা ও ষাট ফিট চওড়া। এর ছাদ একটু নীচু। ২৭টি সুবৃহৎ স্তম্ভ এই লঙ্কার ছত্র ধারণ ক'রে রয়েছে। প্রত্যেক স্তম্ভটি অতি সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত। দক্ষিণের স্তম্ভগুলি আবার একটি নীচু পাষাণ-বেষ্টনী দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। এই বেষ্টনীর ভিতর দিকটি ভাস্কর্য্য-মণ্ডিত। দক্ষিণ পশ্চিম কোণে মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি; তার পর অর্দ্ধ-নারীশ্বর। তৃতীয় ভৈরব বা বীরভদ্র, চতুর্থ হরপার্ব্বতী, পঞ্চম শিবদুর্গা ও গণেশ। সব শেষে করোটী-কিরীট-শিরে রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য!

লঙ্কার বিগ্রহ-গৃহ ও গর্ভ-মন্দির অনেকটা কৈলাসের প্রধান মন্দিরের অনুকরণেই তৈরী করা হয়েছে দেখা গেল। প্রদক্ষিণ-পথের দক্ষিণে রাবণের কৈলাস উৎপাটন ও উত্তরে শিবদুর্গার অক্ষক্রীড়ার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করা রয়েছে। বিগ্রহ-গৃহের দ্বারপার্শ্বে সেই গঙ্গা যমুনার মূর্ত্তি। বিগ্রহ-গৃহের পশ্চাতের দেওয়ালে ত্রিমূর্ত্তি, শিব অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের এই তিন মুখ তাঁর একই দেহে দেখানো হ'য়েছে।

কৈলাস-মন্দির-প্রাঙ্গণের চারিপার্শ্বের পর্ব্বত-বেষ্টনীর মধ্যে যে সুদীর্ঘ অলিন্দ-গুহা বা বারান্দা আছে, পূর্ব্বেই বলেছি তার পশ্চাতে প্রাচীর-গাত্রে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা আছে। পূর্ব্ব প্রান্ত থেকে সুরু ক'রলে প্রথমেই আমরা দেখতে পাই সূর্য্য-গ্রহ বা অরুণ দেবতা। তার পরই বরাহ-অবতার। তার পরেই তাপসী উমা। এইবার একটি কক্ষ। কক্ষাভ্যন্তরে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, মধ্যে চতুর্ভুজ শিব। শিবের সঙ্গেই
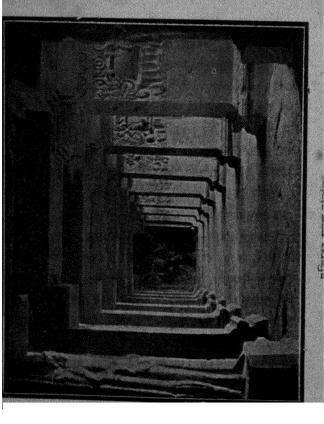
একপাশে নন্দী, একপাশে ভৃঙ্গী। তার পরই আবার বারান্দা। প্রথমে নৃসিংহ-অবতার, তার পর গণপতি। দক্ষিণে দ্বারপাল। পশ্চিমে সপ্ত-মাতৃকা।
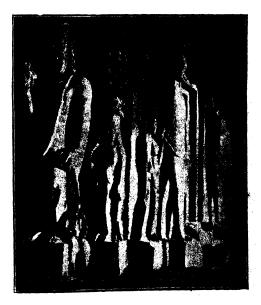
মন্দির-পরিবেষ্টিত মূর্তিশ্রেণী (ব্রাহ্মণ্য ভাস্কর্য্য)

প্রাঙ্গণের উত্তরদিকে একটি ছোট দেব-মণ্ডপ। মণ্ডপের সম্মুখে দুটি স্তম্ভ। ভিতরের দিকে দেওয়ালে তিনটি নদী-মাতৃকার মূর্ত্তি। মকর-বাহন
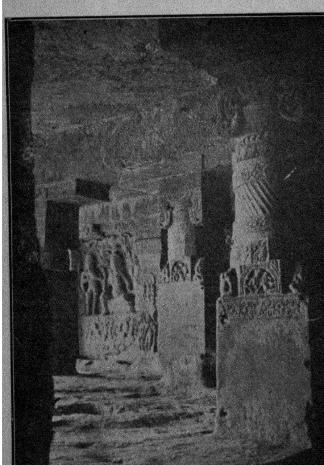
গঙ্গা, কূর্ম্মবাহন যমুনা, পদ্মবাহন সরস্বতী। পট-ভূমিকায় লতা-গুল্ম, সরীসৃপ, জলজ তরু প্রভৃতিও উৎকীর্ণ করা আছে।

দক্ষিণদিকের বারান্দায় পরের পর বারোটি সুবৃহৎ মূর্ত্তি আছে। চতুর্ভুজা যোগমায়া, বলরামজী, কালীয়-দমন, বরাহ-অবতার, গোবর্দ্ধনধারী, অনন্ত-শয্যা, নৃসিংহ, দত্তাত্রেয়, চতুর্ভুজ শিব ও অর্দ্ধনারীশ্বর। উত্তরদিকেও বারোটি মূর্ত্তি আছে। দশমুণ্ড রাবণের মাথায় শিবলিঙ্গ। গৌরী, হর-পার্ব্বতী, শিব-দুর্গা, বিষ্ণু, পার্ব্বতী, লক্ষ্মী-নারায়ণ, বলভদ্র ইত্যাদি। পূর্ব্বদিকের বারান্দায় ১৯টি মূর্ত্তি আছে। হরপার্ব্বতী, ভৈরব, দৈত্যাসুর, কালভৈরব, বালভৈরব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের এমন সুন্দর সমন্বয় খুব কম মন্দিরেই দেখতে পাওয়া যায়। কৈলাসের বিস্ময়কর শোভা, সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য দেখতে দেখতে, তার স্থাপত্য-কলা ও ভাস্কর্য্য-শিল্পের অপরূপ নৈপুণ্য আলোচনা ক'রতে ক'রতে আমরা এমনই মুগ্ধ ও তন্ময় হ'য়ে গেছলুম যে, বাইরে আমাদের মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে—আজই এখনই ৫৬ মাইল দূরে চাল্লিশগাঁও ষ্টেশনে বেলা একটার ট্রেণ ধরবার জন্য রওনা হ'তে হবে—এ-সব কথা একেবারেই ভুলে গেছলুম। কৈলাস পর্য্যবেক্ষণ যখন শেষ হ'লো, ঘড়ী খুলে দেখলুম ১১টা বাজে! এখনও ইলোরার অনেক গুহাই দেখা বাকী রয়েছে! তখন প্রায় একরকম ছুটতে ছুটতেই আমরা বিদ্যুৎ-বেগে কয়েকটি মাত্র বৌদ্ধ ও জৈন গুহা দেখে নিয়ে ইলোরা থেকে বেরিয়ে পড়লুম। বৌদ্ধ ও জৈন গুহাগুলি আমরা যে-রকম তাড়াতাড়ি দেখা শেষ করেছিলুম, তাতে তার কোনও বিশদ বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। বৌদ্ধ গুহাগুলির সম্বন্ধে পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, অজন্তা গুহার সঙ্গে তার বহু সাদৃশ্য আছে। এগুলি খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে নির্ম্মিত ব'লে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন। জৈন গুহাগুলির মধ্যে দু' একটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে আমি ইলোরার প্রসঙ্গ শেষ ক'রবো।

ইলোরার বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য গুহা সংখ্যায় যেমন ১৫।১৬টি ক'রে দেখতে পাওয়া গেল, জৈন গুহা কিন্তু সংখ্যায় অতগুলি নয়। মোটে পাঁচ ছ'টি

কৈলাসে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মন্দির
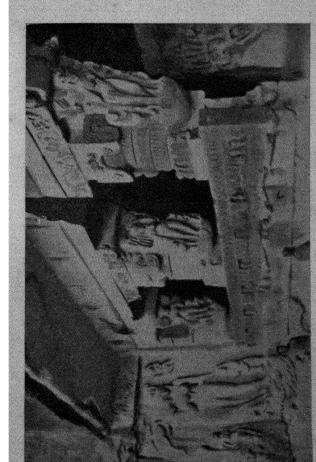
মাত্র! বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য গুহাগুলি যেমন প্রায় পাশাপাশি অবস্থিত, জৈন গুহাগুলি কিন্তু সে ভাবে অবস্থিত নয়! ব্রাহ্মণ্য গুহার উত্তর প্রান্ত থেকে প্রায় ২০০ গজ তফাতে জৈন গুহা আরম্ভ হ'য়েছে। এগুলির নির্ম্মাণকাল খৃষ্টীয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ব'লে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন।

জৈন গুহার প্রথমটির নাম 'ছোট কৈলাস।' এটি সব শেষ তৈরী হ'য়েছিল এবং হুবহু কৈলাস মন্দিরের অনুকরণে! তবে আকারে কৈলাসের চেয়ে অনেক ছোট। তাই এর নাম হ'য়েছে 'ছোট কৈলাস'। দ্বিতীয়টির নাম 'ইন্দ্রসভা'। ইন্দ্রসভা যদিও দুটি দ্বিতল ও একটি একতল গুহার সমাবেশে সৃষ্ট হ'য়েছিল, কিন্তু এর প্রথমটিকেই লোকে 'ইন্দ্রসভা' ব'লে উল্লেখ ক'রে; দ্বিতীয়টিকে ব'লে 'জগন্নাথসভা'।

ইন্দ্রসভার তোরণ-দ্বার দক্ষিণ দিকে। এই দ্বারের পূর্ব্বাংশে একটী মন্দির আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে নগ্ন পার্শ্বনাথের বিগ্রহ আছে। পার্শ্বনাথের মাথার উপর ছত্রধারিণীরা সপ্ত-নাগছত্র ধারণ ক'রে রয়েছে। ছত্রধারিণী-দের নীচে তরুণী নাগিনীদ্বয় এবং উপরে মহিষবাহন যমরাজ রয়েছেন। তাঁর পশ্চাতে আরও উপর দিকে গন্ধর্ব্বগণ শঙ্খ বাজিয়ে চলেছে।

পার্শ্বনাথের দক্ষিণে সিংহ-পৃষ্ঠে এক দৈত্য। তার নীচে পার্শ্বনাথের এক ভক্ত দম্পতির মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। তার পাশে আরও দক্ষিণে রয়েছেন গোতম স্বামী। ইনিও উলঙ্গ। এঁর সঙ্গে একাধিক ভক্ত নর-নারী আছেন। মন্দিরাভ্যন্তরে বিগ্রহ হ'চ্ছেন 'মহাবীর'। ইনি জৈন তীর্থঙ্করদের মধ্যে সর্ব্বশেষ জন। মহাবীর বিগ্রহের পশ্চাতের দেওয়ালে রয়েছেন ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী এক তরুতলে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ওটি ইন্দ্রাণী নয়—জৈন দেবী অম্বা বা অম্বিকা!

এতো গেলো ইন্দ্রসভার বাইরের ব্যাপার। ভিতরে মন্দির-প্রাঙ্গণে
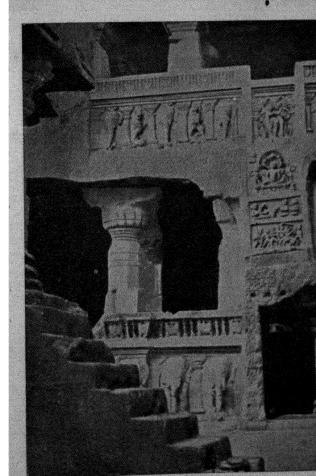
প্রবেশ ক'রলে প্রথমেই চোখে পড়ে, দক্ষিণে পাষাণ-বেদীর উপর এক প্রকাণ্ড ঐরাবত। বামে একটা সুন্দর স্তম্ভ ছিল, সেটা ভেঙে পড়েছে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি মণ্ডপ বা মন্দির। এই মন্দিরের মধ্যে এক চতুর্ম্মুখ মূর্ত্তি, সম্ভবতঃ ২৪জন জৈন তীর্থঙ্করদের মধ্যে কেউ হবেন। কেউ বলেন, উনি প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ; কেউ বলেন উনি শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর! এই তীর্থঙ্করের বেদীটা চক্রযুক্ত এবং সিংহবাহন; পৌরাণিক রাজন্যগণের বসবার সিংহাসনের মতো।

প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে একটি প্রশস্ত গুহা আছে। এই গুহার দক্ষিণ-দিকের দেওয়ালের মধ্যস্থলে ত্রয়োবিংশৎ জৈন-তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি। তার বিপরীত দিকের দেওয়ালে রয়েছে হরিণ ও কুকুর সঙ্গে নিয়ে গৌতম স্বামী।

এই পার্শ্বনাথ, মহাবীর, গৌতম স্বামী প্রভৃতি তীর্থঙ্করদের একই রকম মূর্ত্তি জৈন গুহাগুলির প্রায় সব কটিতেই পুনঃ পুনঃ দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চাতের দেওয়ালে সেই ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী বা অম্বিকা দেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা।

ইন্দ্রসভার একটি জৈন গুহার মধ্যে দেখলুম, বারান্দার প্রাচীর-গাত্রস্থ সকল থামের গায়ে ষোড়শ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের প্রকাণ্ড দু'টী নগ্ন প্রতিমূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা রয়েছে। মূর্ত্তির তলায় কার মূর্ত্তি এবং কে নির্ম্মাণ ক'রেছে, তাদের নাম লেখা র'য়েছে।

দ্বিতলের বারান্দার উপর উঠে বারান্দার প্রান্তভাগে ইন্দ্র ও অম্বিকার বিরাট প্রতিমূর্ত্তি চোখে পড়ে। বট-বৃক্ষতলে ইন্দ্র এবং আম্রবৃক্ষতলে অম্বিকা। সঙ্গে তাঁদের অনুচরবর্গ। বারান্দার দেওয়ালে সারি-সারি সমস্ত জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ র'য়েছে দেখা গেল।

দ্বিতলের প্রশস্ত দালান, ছত্রতল, প্রাচীর, সমস্তই যে এক কালে সুরঞ্জীন

ইন্দ্রসভার ইন্দ্রমূর্ত্তি

মধ্যভারত

চিত্রে পরিশোভিত ছিল, তার নিদর্শন আজও লুপ্ত হয়নি একেবারে। ধ্বংসাবশেষ এখনও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

'ইন্দ্রসভা' ভাল ক'রে দেখা শেষ না ক'রেই আমাদের পালিয়ে আসতে হ'লো। ঘড়ীর কাঁটা ক্রমাগতই ছুটছিল একটার দিকে! পাছে ট্রেণ মিস্ করি ব'লে আর কালবিলম্ব না ক'রে মোটরে উঠে আমরা চাল্লিশ-গাঁওয়ের দিকে রওনা হলুম।

ইলোরা থেকে চাল্লিশগাঁওয়ে যাবার পার্ব্বত্য-পথ যে এত সুন্দর, সে আমাদের ধারণাই ছিল না! এক পাশে উঠে গেছে গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালা, সুশ্যাম বনানী-বেষ্টিত!—আর এক দিকে নেমে গেছে একেবারে অতলস্পর্শী খাদ, কোন্ দূর শালবন ও স্বর্ণক্ষেত্রের মধ্যে; সামনে অসীম আকাশ! পাহাড়ের পাশ দিয়ে দিয়ে সরু একটু পথ এঁকে-বেঁকে উঠে-নেমে ঘুরে-ঘুরে চলেছে। সে-দিন সকালে আমাদের চোখে চারিপার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য এমন একটি স্বপ্নলোকের মায়া বিস্তার ক'রেছিল সেখানে, যে, আমাদের মনে হ'চ্ছিল, যেন কোন্ অলকাপুরী পরিদর্শনে চ'লেছি আমরা! প্রকৃতির এই ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী রূপ—এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখে আর একবার এমনিই অপরিসীম আনন্দে মুগ্ধ ও বিহ্বল হ'য়ে পড়েছিলুম—সে শিলং থেকে চেরাপুঞ্জী যাবার পথে! তিরিশ মাইল পথ মনে হয় যেন মেঘরাজ্য ভেদ ক'রে আকাশের বুকের ভিতর দিয়ে চলেছি বৈজয়ন্তীর তোরণাভিমুখে! কোথায় লাগে তার কাছে দার্জ্জিলিঙ, সিমলার সৌন্দর্য্য!

ইলোরা থেকে চাল্লিশগাঁওয়ে যাবার পথে যে আমাদের জন্য এত বড় একটা বিস্ময় ও আনন্দ অপেক্ষা ক'রছিল, এ আমরা কেউ কল্পনাই করিনি। তাই, সেই আশাতীত কিছু পাওয়ার হর্ষ ও তৃপ্তি আমাদের সকলের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ভাবনা সব যেন ভুলিয়ে দিয়েছিল!
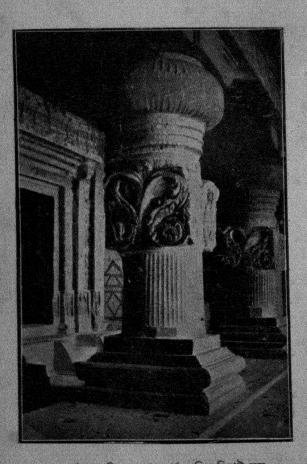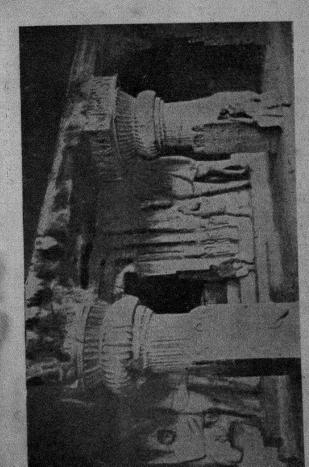
হঠাৎ জানতে পারা গেল মোটর থেকে গোরক্ষপুরের দিবাকরবাবুর 'বেডিংটা' কেমন ক'রে কখন রাস্তায় প'ড়ে গেছে! গাড়ী খানিক-দূর পেছিয়ে নিয়ে এসে খোঁজা হ'লো—পাওয়া গেল না! এদিকে আমাদের তখন আর একটী মিনিটও বিলম্ব করবার উপায় নেই। চাল্লিশগাঁওয়ে একটার ট্রেণ যেমন ক'রে হোক ধ'রতেই হবে, নইলে একটা দিন মারা যায়! একজন সাইক্লিষ্ট ছোক্‌রাকে সেই সময় বিপরীত দিক্ থেকে আসতে দেখে তাকে ব'লে দেওয়া হ'লো যে, সে যেন খোঁজ ক'রে সেটি উদ্ধার করে। মোটর ড্রাইভারের সে চেনা লোক। মোটর ড্রাইভারকে ব'লে দেওয়া হ'লো চাল্লিশগাঁও থেকে ফেরবার সময় সে যেন সেই বেডিংটি উদ্ধার ক'রে আওরাঙ্গাবাদ ষ্টেশনে দিয়ে আসে। আওরঙ্গাবাদের ষ্টেশন মাষ্টারকে পত্র লিখে দেওয়া হ'লো যে, তিনি যেন সেই বেডিং মোটর ড্রাইভারের কাছ থেকে নিয়ে—"মানমাদ" ষ্টেশনে পাঠিয়ে দেন। দিবাকরবাবু বোম্বে থেকে ফেরবার পথে মানমাদ থেকে সেটি গাড়ীতে তুলে নেবেন।

পথের দু'ধারের স্বর্গীয় দৃশ্যের পরম আনন্দে দিবাকরবাবু তাঁর বেডিংয়ের কথা অচিরাৎ বিস্মৃত হ'লেন। মিনিট দশ পনেরো মাত্র শুনেছিলুম—তাই তো, নূতন আস্কোরা কম্বল একখানা আছে ওর মধ্যে। এই আস্‌বার আগে নূতন মশারী তৈরী করিয়ে এনেছি! বিছানার চাদর এক ধোপ পড়েছে মাত্র! লেপখানা বেশী দিনের নয়—ইত্যাদি! ত ! পর কোথায়ই বা বিছানা—কোথায়ই বা চাদর—আর কোথায়ই বা মশারী—সব মন থেকে ধুয়ে-মুছে গিয়ে একটা শুধু অনির্ব্বচনীয় পুলকের পরম অনুভূতি আমাদের চিত্ত-ক'টি পূর্ণ ক'রে তুলেছিল!

আমাদের মোটর যখন চাল্লিশগাঁও ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো—একটা বাজতে তখন আর মাত্র ১৫ মিনিট বাকী! খুশী হয়ে মোটরওয়ালাকে

বখ্‌শীস্‌ দিয়ে বিদায় করলুম ; কিন্তু দুরন্ত ক্ষুধায় তখন আমরা ক'জনেই আক্রান্ত ! দাদাকে ষ্টেশনের প্লাটফর্মে বসিয়ে বঙ্কিমবাবু গেলেন নাসিকের টিকিট্‌ ক'রতে এবং আমি ও দিবাকরবাবু গেলুম কিছু পিত্তিরক্ষার মতো খাদ্য সংগ্রহ ক'রতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মুড়ি, ছোলা ভাজা, জিলাপী ও কলা ছাড়া আর কিছুই সে ষ্টেশনে সংগ্রহ ক'রতে পারা গেলনা। অগত্যা তাই কিনে নিয়ে এসে আমরা কোনও রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলুম। অবিলম্বে ট্রেণ এসে পড়লো। কুলির সাহায্যে মালপত্র তুলে নিয়ে আমরা নাসিক রওনা হলুম।

বেলা চারটে নাগাদ আমরা নাসিক-রোড ষ্টেশনে এসে পৌছলুম। নাসিকে আমাদের এক আত্মীয় থাকেন শ্রীমান সুবোধ বসু। গভর্মেণ্ট প্রিণ্টিং অফিসে কাজ করেন তিনি। আমরা স্থির করেছিলুম রাত্রে তাঁর ওখানে খেয়ে নিয়ে বোম্বাই রওনা হবো। নাসিক-রোড ষ্টেশন থেকে মোটরবাসে করে আমরা নাসিক টাউনে গিয়ে পৌঁছলুম। পথে যেতে যেতে সুবোধ বসুর বাসার সন্ধান করলুম ; কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর ঠিকানা খুঁজে বার করতে পারলুমনা। তখন ৫টা বেজে গেছে। সূর্য্য ডোব্‌বার আগে নাসিক দেখে নিতে হবে। সুবোধ বসুর সন্ধান পরিত্যাগ ক'রে নাসিক শহর থেকে আমরা দশ টাকা ভাড়ায় একখানি মোটর ঠিক ক'রে ত্র্যম্বকেশ্বর দর্শন ক'রতে চললুম। ত্র্যম্বকেশ্বর নাসিক থেকে ১৮ মাইল দূরে। নাসিকের এই ত্র্যম্বকেশ্বর দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। ভারতের এক মহাতীর্থ। কাথিয়াবাড়ের সোমনাথ, উজ্জয়িনীর মহাকাল, আহম্মদনগরের নাগনাথ, দেওঘরের বৈদ্যনাথ, পুণার ভীমশঙ্কর, হিমালয়ের কেদারেশ্বর, কাশীর বিশ্বনাথ, কর্ণাটের মালিকার্জ্জুন বা শৈলেশ্বর, মান্দ্রাজের দক্ষিণে রামেশ্বর, মালবের ওঙ্কারনাথ, কৈলাসের গ্রীম্মেশ্বর এবং নাসিকের এই ত্র্যম্বকেশ্বর এরা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ বলে খ্যাত।

ত্র্যম্বকেশ্বরের মন্দির-সন্নিকটে বিন্ধ্যগিরি থেকে পুণ্যতোয়া গোদাবরী নদীর উৎপত্তি।

আমরা বিন্ধ্যগিরির উপর থেকে সূর্য্যাস্ত দেখবো ব'লে মোটরওয়ালাকে সূর্য্য থাকতে থাকতে ত্র্যম্বকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিতে পারলে বখশীস্ দেবো বললুম। সেও প্রাণপণে মোটর ছুটিয়ে দিলে। ফাঁকা রাস্তা, দু'ধারে শুধু বিস্তৃত মাঠ। তীরবেগে মোটর ছুটলো সূর্য্যের নাগাল ধরবার জন্য। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য তখন বিন্ধ্যগিরি-শিখর-পার্শ্ব হ'তে আমাদের রকম দেখে সম্ভবতঃ হাসছিলেন! সূর্য্য আগে পালাবেন, কি আমরা গিয়ে তাঁকে ধ'রতে পারবো বিন্ধগিরির উপর—এই নিয়ে আমাদের মধ্যে ঘোর তর্কবিতর্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। সূর্য্যের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের মোটর তখন ছুটছিল প্রচণ্ড বেগে! কিন্তু, বিন্ধ্যপর্ব্বতমূলে আমাদের গাড়ী পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই মানবের স্পর্দ্ধাকে যেন উপহাস ক'রে স্বর্ণবর্ণ সূর্য্য অস্তাচলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন! সন্ধ্যার আঁধার-অবগুণ্ঠনের প্রান্তটুকু মাত্র দেখা যাচ্ছে যখন দিগন্তের দিকে, সেই সময় আমরা তিনজনে তিনখানা ডুলি করে ৭৫০ সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের উপর উঠলুম গোদাবরীর উৎস দেখতে। দিবাকরবাবু ডুলি নিলেন না, হেঁটেই উঠে এলেন।

কিন্তু, গোদাবরীর উৎস দেখে আমরা অত্যন্ত হতাশ হলুম! এত কষ্ট ক'রে ছুটে আসা ও ডুলী করে পাহাড়ের উপর উঠা বৃথা ব'লে মনে হ'লো; কারণ গোদাবরীর উৎস ব'লে যে স্থান আমাদের দেখানো হ'লো, সে একটি সম্পূর্ণ ফাঁকি মাত্র! নিছক যাত্রী-ঠকানো ছাড়া আর কিছুই নয়। মন্দিরের ভিতর পাহাড় থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে! সেই যদি গোদাবরীর উৎস হয়, তা হ'লে গোদাবরীর একান্তই দুর্ভাগ্য বলতে হবে!

পাহাড়ের উপর থেকে বিরক্ত হয়ে নেমে এসে আমরা ত্র্যম্বকেশ্বর দর্শন করলুম। তখন রাত্রি হয়েছে প্রায় আটটা! আমাদের সঙ্গে একজন মারহাট্টি ছেলে গাইড্ হ'য়ে এসেছিল। ছেলেটি বেশ ইংরাজী ব'লছিল। খুব ভদ্র! শুনলুম কলেজে পড়ে। এখন ছুটী, তাই দেশে এসে পৈতৃক পেশা ধ'রে কিছু উপার্জ্জন ক রছে।

ত্র্যম্বক দর্শন ক'রে আমরা নাসিকে পঞ্চবটী দেখতে গেলুম, যেখানে লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাসিকা ছেদন ক'রেছিলেন। এই পঞ্চবটী ও গোদাবরী আমরা দক্ষিণে যাবার সময় মান্দ্রাজ অঞ্চলে দেখেছি এবং সেই দিক দিয়েই যে রামচন্দ্র গেছলেন, সেটা মেনে নিতে রাজি আছি; কিন্তু, এই নাসিকের পঞ্চবটী যে নকল ও জাল, তাতে আর কোনও ভুল নেই। সুতরাং এখানে সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদও হয় নি এবং সেজন্যও এর নাম নাসিক নয়। এখানে সুদর্শনচক্রে বিচ্ছিন্ন সতীর নাসিকা পতিত হয়েছিল। তাই এ স্থানের নাম নাসিক এবং ৫২ পীঠের একটি তীর্থরূপে পরিগণিত। এই মতটা বরং গ্রহণ করা যেতে পারে।

পঞ্চবটী থেকে বেরিয়ে আমরা সোজা নাসিক-রোড ষ্টেশনে চ'লে এলুম। তখন রাত্রি ৯৷৹টা বাজে! সুতরাং নাসিকের বিখ্যাত গুহাগুলি দেখে যাবার বাসনা এবারকার মতো পরিত্যাগ ক'রতে হ'লো।

রাত্রি দশটায় বোম্বায়ের গাড়ী। সুতরাং আমরা কিছু আহার সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়লুম। কিন্তু, চা ও গরম দুধ ছাড়া আর কিছুই ষ্টেশনে পাওয়া গেলনা। জলধরদা' দুধ খেলেননা—শুধু এক কাপ চা খেয়ে নিলেন। আমরা কেউ কেউ এক এক গ্লাস দুধও খেলুম—চা'ও ছাড়লুমনা।

নাসিক যাবার সময় আমাদের সমস্ত মালপত্র ষ্টেশনে "Left

Luggage" ক'রে রেখে গেছলুম। সেগুলি খালাস ক'রে নিলুম। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ সিল্ক-ব্যবসায়ী শ্রীমান্ প্রভাসচন্দ্র গুঁই আমাদের তাঁর গৃহে অতিথি হবার জন্য আমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। নাসিকে নেমেই বিকেলা আমরা তাঁকে বোম্বাইয়ে একখানি টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছিলুম। গাড়ী এসে পড়তেই আমরা একখানি খালি কামরা দেখে উঠে পড়লুম। সারারাত ঘুমোনো চাই তো; বিশেষ, পেটে যখন কিছু নেই!

৪ঠা জানুয়ারী ভোর পাঁচটায় বোম্বাই গিয়ে পৌঁছলুম। বোম্বাই শহর আমাদের কলিকাতা মহানগরীর চেয়ে যে দেখতে সুন্দরী-সে বিষয়ে কোনও ভুল নেই। একদিকে মালাবার-গিরি, আর একদিকে সাগর পেয়ে বোম্বাইয়ের রূপ যেন উথলে উঠেছে! সেখানকার ঘরবাড়ী-গুলিতেও একটি ভারতীয় শ্রী বিরাজ করছে। তিনদিন মাত্র আমরা বোম্বাইয়ে ছিলুম। তারই মধ্যে বোম্বাইয়ের Bengal Clubএর বাঙালী সভ্যবৃন্দ 'জলধরদাদাকে' নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে একদিন অভিনন্দন দিলেন। বোম্বাইয়ের প্রভাসবাবু সপরিবারে আমাদের ক'জনকে খুব আদর-যত্ন ক'রেছিলেন। আমি একদিন বোম্বাই থেকে বেরিয়ে গিয়ে শিবাজী-তীর্থ—বালগঙ্গাধর তিলকের জন্মভূমি পুণ্য পুণা-শহর ঘুরে এলুম। নূতন শহরটি বেশ ঝকঝকে হ'য়ে উঠছে। বোম্বাই থেকে পুণা যাবার রেলপথের দূরত্ব মাত্র ১১৯ মাইল। কিন্তু এর মধ্যে বোধ হয় খুব কম ক'রে অন্ততঃ ২৭টি টানেল্ আছে!

পুণা থেকে ফিরে এসে সেইদিনই রাত্রে অর্থাৎ ৬ই জানুয়ারী আমরা কলকাতা রওনা হলুম। দিবাকরবাবু ও বঙ্কিমবাবু আগের দিনই চলে গেছলেন। আমার ছুটীর তখনও দিন পনেরো হাতে ছিল, তাই কলকাতা ফেরবার পথে মোগোলসরাইয়ে নেমে আমি কাশী চ'লে গেলুম; দাদা কলকাতায় ফিরে গেলেন।